কেমন হতে পারে গাজওয়াতুল হিন্দ ? কি করব আমি ?

■ গাজওয়াতুল হিন্দের বিস্তারিত বিশ্লেষণ

রিবাতি মুহাম্মাদ

কেমন হতে পারে গাজওয়াতুল হিন্দ; কি করব আমি?

রিবাতি মুহাম্মাদ

- *“গাজওয়াতুল হিন্দ” বলতে ইমাম মাহদি এবং ঈসা (আঃ) এর আগমনের কিছুকাল আগে অথবা সমসাময়িক সময়ে এই পাক-ভারত-বাংলাদেশে মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যকার সংগঠিত যুদ্ধকে বুঝায়”*

সূচীপত্র

ভূমিকা

أَعـوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয়দাতা প্রতিপালক আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। দয়াময় মহামহিম আল্লাাহর নামে শুরু করছি। দুরুদ ও সালাম মুহাম্মাদ আরাবি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সত্যনিষ্ঠ অনুসারীদের ওপর।

গাজওয়াতুল হিন্দ কি, কার সাথে এই যুদ্ধ, কি হবে এর ফলাফল? হয়তো সবাই তা জানে। কিন্তু কেমন হবে এই ভয়াবহ যুদ্ধটি, এই যুদ্ধের রূপরেখাই বা কি, কত দীর্ঘ হবে, মুজাহিদীনদের ভূমিকা কি হবে, কারা কারা, কে কোন মতলবে - কাদের পক্ষে, কাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সবার কাছে সতত স্বচ্ছ নয়। তারই উত্তর জেনে নিতে **গাজওয়াতুল হিন্দের** বিশ্লেষণ নিয়ে আমাদের এই কলেবর। সাথে একজন একাকী ব্যক্তির জন্যে আমরা যুদ্ধের একটি ছক এঁকে দিব, যা তাকে প্রস্তুত করবে গাজওয়াতুল হিন্দের জন্যে।

বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে এবং উপমহাদেশের অন্য কোন ভাষাতে গাজওয়াতুল হিন্দের এত বিস্তৃত বিশ্লেষণ, আপডেট পর্যবেক্ষণ, পরিস্থিতির মূল্যায়ণ ও বাস্তবিক নির্দেশনা আছে বলে আমাদের জানা নেই। গাজওয়াতুল হিন্দ নিয়ে আমাদের এই কাজটি তাই অবশ্যই আপনার গুরুত্বের দাবী রাখে। কলেবর যাতে বড় হয়ে না যায়, সেজন্যে আমরা এখানে একটি অযথা কথারও জেনেশুনে অনুপ্রবেশ ঘটাইনি। কিন্তু এটি শুধু গাজওয়াতুল হিন্দ নিয়ে হাদিস ও আছারের একটি প্রামাণ্য বই-ই নয়, বরং পুরো উপমহাদেশের সার্বিক পরিস্থিতির একটি প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনাও। সে হিসেবে শুধু নিত্যকার সংবাদগুলো থেকে কিছু সংবাদ তুলে ধরলেও বইটির কলেবর ধারণাতীত বৃদ্ধি পেত। অথচ আল্লাহর শান, এমন বিস্তৃত একটা কাজ এত অল্প কলেবরেই শেষ করার তাওফিক দিয়েছেন।

তাছাড়া, হিন্দুস্তানের ভৌগলিক অবস্থান, ইসলামের আগমন, কালের প্রবাহে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, সংগ্রাম-সাধনা, হিন্দুত্ববাদ ও ইসলামের চির বৈরীতা নিয়েও অনেক কিছু লেখার ছিল। প্রাসঙ্গিক তো বটেই। কিন্তু গাজওয়াতুল হিন্দকে মূল ফোকাসে রাখতে সে দিকেও কলম চালাইনি।

বইটি লেখার আগে থেকেই একটি উদ্দেশ্য ছিল- বইটিকে অন্তত এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাতে গাজওয়াতুল হিন্দের ব্যাপারে মোটামুটি হলেও পূর্ণাঙ্গ একটা কাজ হয়। যে কেউ যেন এই একটি

বই থেকেই গাজওয়া সংক্রান্ত সকল দিকের আনুষঙ্গিকতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে। আর একটা নিয়ত যেটা সব কাজেই থাকে- তা হল দাঈ ভাইদের কথা চিন্তা করে করা। সুতরাং দাঈ ভাইয়েরাও যেন একটি বই দিয়েই গাজওয়া সংক্রান্ত দাওয়াতের একটা পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টা চালাতে পারে সে প্রচেষ্টাও করা হয়েছে। তবে সময়, ইলমের দৈন্যতা, পরস্থিতির কারণে প্রয়োজনীয় তথ্যের সংগ্রহ ও সংযোজনের ঘাটতির জন্যে কিছুটা হলেও অপূর্ণ মনে হতে পারে! আল্লাহর দিকেই রুজু হচ্ছি।

বইটি লিখতে গিয়ে একটি অভিব্যক্তি বর্ণনা করি- যখন আমি এই বইটি লেখা শুরু করি, তখন থেকে প্রতিনিয়তই উপমহাদেশীয় খবরাখবরের দিকে একটু বাড়তি গুরুত্বের সাথে নজর রাখতাম। এবং প্রতিনিয়তই এমন সব ঘটনাপ্রবাহ, ঘাত-প্রতিঘাত ঘটে চলছিল এবং চলছে, প্রতি মূহুর্তেই উপমহাদেশীয় যুদ্ধ তথা গাজওয়াতুল হিন্দের প্রেক্ষাপট স্পষ্ট হয়ে আসছে। এমনকি আমি লেখা বন্ধ করে দিয়েছি, কখনো বা পেরেশান হয়েছি যে এত ঘটনা-দুর্ঘটনা যা হিন্দু-মুসলিমের চূড়ান্ত যুদ্ধের দিকে বাঁক নিচ্ছে- এ সকল ইদানীন্তন তথ্য-বিশ্লেষণ যোগ করলে বইটি নির্ঘাত হাজার পৃষ্ঠা অতিক্রম করত। এর মাঝে শ্রীলংকায় মাসজিদ পুড়িয়ে দেওয়া, আসাম-কর্ণাটকের লক্ষ মুসলিমের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া, কাশ্মিরের ৮ বছরের মেয়ে আসিফাকে মন্দিরে বন্দী রেখে ধর্ষণ-হত্যার ঘটনা অন্যতম বটেই। এর বাইরেও খবর আছে। ভয়ের, আশঙ্কার সে খবর।

আমরা সে দিকেও যাইনি। মূল বিষয়েই থেকেছি। ভাসাভাসা ভাবে জরুরী কথাগুলো বলার চেষ্টা করেছি। যেগুলোর সামান্য বিশ্লেষণও একেকটি স্বতন্ত্র বইয়ের রূপ নিবে! তাই বিস্তৃত পরিমন্ডলে যাইনি। যাওয়ার দরকারও নেই। সাগর যখন বাস্তবেই প্রবাহমান তখন দু'ফোঁটা পানি ছিটিয়ে তার সত্যতা প্রমাণের কি প্রয়োজন! অন্ধরা চিরকালই অন্ধ থাকে। আর ঘুমন্তরা তো মৃতদের মতোই। গাজওয়াতুল হিন্দ নিয়ে আমাদের প্রচেষ্টা তাই চক্ষুস্মান ও জাগ্রতদের প্রতি। তবে কামনা করি সব অন্ধত্ব ঘুচিয়ে যাক, মৃতরা জেগে ওঠুক।

গাজওয়াতুল হিন্দ বা হিন্দুস্তানের যুদ্ধ-জিহাদের সাথে অনুচ্চস্বরে ঈমান ও তাওহীদ, ত্বগুত ও শির্ক, আল ওয়ালা ওয়াল বারা'আর বিষয়টিও গুঞ্জরিত হয়। কিন্তু ঈমান, ওয়ালা বারা'আ, ত্বগুত নিয়ে আলোচনা করলে আবার মূল প্রসঙ্গের আবেদন ম্লান হওয়ার আশঙ্কা। আলোচনাও অনেকটা নিরস হবে! আবার এগুলোকে অস্বীকারও করা যায়না! গাজওয়াতুল হিন্দের প্রেক্ষাপটে এগুলো অতি জরুরী নিয়ামক।

আল্লাহর শোকর, "উম্মাহ; একটি বিলুপ্ত চেতনা" নামে একটা দার্শনিক মূল্যায়ননির্ভর প্রাবন্ধিক আলোচনা দিয়ে প্রকারান্তরে উম্মাহ, ঈমান, কুফর, ত্বগুত, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ওয়ালা বারা'আসহ প্রায় সকল বিষয়েরই মুখরোচক আলোকপাত করা হয়ে গেছে! সাথে গাজওয়াতুল হিন্দের সাথে ব্যালেন্সটাও অক্ষত রয়ে গেল!

বইটি পড়তে গিয়ে অনুধাবন করবেন- এর বিষয়বস্তুর অধিকাংশজুড়ে আছে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। তাই আমরা বিভিন্ন সোর্স ও খাতের দ্বারস্থ হয়েছি। আবার প্রাসঙ্গিক হিসেবে অনেকের বক্তব্য, আর্টিক্যাল-প্রবন্ধের অংশবিশেষ বা অনেক কিছুই আমরা এখানে যুক্ত করেছি। বইটি পড়তে গিয়ে কেউ হয়তো দেখবে তারই লেখা আর্টিক্যাল বা নোটের পুরো বা আংশিক অংশ এখানে যুক্ত করা হয়েছে! যেমন বইয়ের মাঝে "জাতীয়তাবাদ" বা "নারীদের করণীয়" শিরোনামের ক্ষেত্রে হয়েছে। দ্বীনের জন্যে যারাই যা কিছু করি তা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই। তাই এমন একটি প্রচেষ্টায় আপনাদের কোন মেহনত থেকে যদি আমরা উপকৃত হই তবে অবশ্যই আশা রাখি আপনারা আনন্দিত হওয়া বৈ নারাজ হবেননা! এক্ষেত্রে আল্লাহ সবাইকে উত্তম জাযা দিন এবং উম্মাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজেদের মেহনতের ফসল যুক্ত হওয়াতেও শুকরিয়া করা উচিত! আলহামদুলিল্লাহ্!

আরেকটি কথা। একদম গতানুগতিকতা পছন্দ হয়না। তাই ভূমিকা বা লেখকের কথা কোন কিছুই লেখার ইচ্ছা ছিলনা, নেইও। তবুও লিখে ফেললাম। কেন, আচ্ছা সেটা এখন থাক! আর এমন ভাবেই লেখার চেষ্টা করেছি, আলাদা করে ভূমিকা দিতে হয়না। বইয়ের শুরুটাই বইয়ের ভূমিকা, পরিচয়। আর সারাটা জুড়েই ভূমিকার ছড়াছড়ি, আর তার সম্প্রসারণে মাখামাখি!

গাজওয়াতুল হিন্দের সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় অধিক বিস্তৃত ও গভীর গবেষণার বিষয় হওয়া স্বত্ত্বেও অল্প কয়েক কথায় ঈমাম মাহদী, দাজ্জাল ও আখেরুজ্জামান নিয়ে একেবারে শেষ দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। তাই...

পড়া হোক। প্রচার হোক। হোক প্রসার! আল্লাহ আমাদের নারী-পুরুষ শিশু-কিশোর প্রতিজনকে ঈমানবিল্লাহ ও কুফর বিতত্বগুতের মাধ্যমে গাজওয়াতুল হিন্দের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার তাওফিক্ব দান করুন। যার থেকে অন্যথা পরিত্রাণের কোন পথ নেই!

রিবাতি মুহাম্মাদ (শুক্রবার প্রভাত)

উম্মাহ একটি বিলুপ্ত চেতনা

মূলত যারা হিন্দের যুদ্ধে মুজাহিদ হিসেবে অংশ নিবে তাদেরকে গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত। কেননা যে কেউই তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেনা! মূলত মিল্লাতে ইবরাহিম অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর সন্তানরাই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। ফলে দেশ সীমানার ভিত্তিতে না বরং মুসলিম উম্মাহর চেতনায় আবিশ্ব থেকে সকল উম্মাহর সন্তানেরা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। এটি একই সাথে ঈমান ও তাওহীদেরও বিষয়! তাই গাজওয়াতুল হিন্দ বুঝা ও মুজাহিদীনদের অন্তর্ভুক্ত হতে হলে আমাদের মুসলিম উম্মাহ কি তা বুঝতে হবে! আমরা মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে মুসলিম উম্মাহ নিয়ে অতি জরুরী আলাপ সেরে নিতে চাই! নতুবা আমাদের কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টা বিফলেই যাবে...

উম্মাহ একটি বিলুপ্ত চেতনা- যা হারানো অতীত। মাত্র কয়েকটি যুগের ব্যবধানে মুসলিম উম্মাহ এমন দূর্বিষহ এক ভয়াবহ সমস্যায় নিপতিত হয়েছে যার করাল গ্রাস থেকে মুক্ত থাকেনি দূর বহুদূরের বিজনভুমির পর্ণকুটিরে বাস করা অশীতিপর বৃদ্ধ বা শহরের আমোদি জীবনের আধুনিক ব্যক্তিটি অথবা মসজিদের সেই মুসল্লিটি যে বিগত ত্রিশ বছর ধরে সামনের কাতারে নামাজ পড়ে আসছে। কঠিন মুসিবত আর ঠাহর করা যায় না এমন অন্ধকারে ছেয়ে গেছে গোটা সমাজ আর শেষ আশ্রয় প্রতিটি মুসলিম পরিবার পর্যন্ত।

আমি একটা স্পর্শকাতর আর নাজুক বিষয় নিয়ে আলাপ করছি যার নাজুকতা থেকে পিতা-মাতা বা সন্তান-সন্ততি কেউই মুক্ত নয়, আর যার ব্যপারে উম্মাহ এতটাই গাফেল আর লা-কেয়ার যে কিছুতেই এ ব্যপারে বোধোদয় হচ্ছে না।

আমি আসলে বলতে চাচ্ছি মুসলিম উম্মাহ তার মৌলিক বিষয় যার দ্বারা সে মুসলিম আর যে কারনে সে দাবি করে সে জমীনে আল্লাহর প্রতিনিধি এবং দুনিয়ার অপরাপর ধর্মগোষ্ঠির মোকাবিলায় সে রাব্বুন নাসের অনুসারি । সে একজন বিশ্বাসী। ফলে সে মুক্তি ও নাজাত আশা করে। সে নিজেকে তার রবের পথে আছে বলে মনে করে আর সে আশা করে জান্নাতে যাবে। ব্যপারটি পুরোটাই বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভুক্ত। যা তার অস্তিত্বের সাথে জড়িত। কোন মূল্যই থাকেনা যদি সে তার বিশ্বাস হারায় আর দৃষ্টিভঙ্গি অসার হয়ে পড়ে। মূলত একজন মুসলিম যে পথভ্রষ্ট হয় এবং তার ওপর থেকে আল্লাহর রহমত উঠে যায় তাহলে সে ইসলাম ত্যাগ করতে পারে ও আল্লাহদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। ইতিহাসে এরকম মানুষ খুবই দুর্লভ কেননা ঈমানের পর কেউ কুফরেরর দিকে ফিরে যাওয়া দূরের কথা, ফিরে তাকানোও পছন্দ করে না। মূলত বিশ্বাস ও কাজের দ্বারা সেই কুফর ও আল্লাহদ্রোহীতা প্রকাশ করে যে মূলত ঈমানই আনেনি ও ইসলাম গ্রহণ করেনি। সুতরাং একজন মুসলিম তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে ঈমানকেই মূল্যায়িত করে, সে কখনো চায় না সে অবিশ্বাসী বা কাফের হয়ে যাক। যার কারনে সে মুরতাদ হবে ও চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে।

তাই ইতিহাসের কোন কালেই মুসলিমদের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গী বিকৃত হয়নি এবং এটিকে তারা অসার হতে দেয়নি। বরং ইহুদি ক্রুসেডার বা ইসলামের শত্রু ও ষড়যন্ত্রকারীরা শুধু মুসলিমদের সাথে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করত। তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করত। তাদের মাঝে অশ্লীলতার বিস্তার ঘটানোর প্রয়াস করত, আরেকটু আগ বাড়িয়ে তাদেরকে নৈতিক পদস্খলের চেষ্টা করত। কখনো আংশিক বা কখনো বিশাল সফলতাও পেত। *এর কোনটায় সেই মুসলিমদের ইসলাম থেকে বের করত না, আল্লাহদ্রোহী বানাত না, ঈমানকে বিকল করত না, আর ভিতরে নিহিত ঈমান যা জ্বলে ওঠার সম্ভাবনায় গদগদ করে তা মিইয়ে যেত না। তাই এই নষ্ট সমাজটার জন্যে শুধু প্রয়োজন হতো দাঈ ও মোজাদ্দীদের। ইসলাম ও সুন্নাহর দিকে প্রকৃতই ঐকান্তিক দাওয়াহ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংশোধনের। দুষিত সমাজটি কেবল মন্দ পরিত্যাগ করলে আর ইসলামের দিক থেকে প্র্যাকটিক্যাল হলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। একজন পাপীর জন্যে শুধু তার পাপ থেকে তাওবাই যথেষ্ঠ হতো। কেননা তার ঈমান নষ্ট হয়নি, সে বিশ্বাসীদের একজন।*

কিন্তু আমরা সব পেছনে ফেলে একটি নতুন ও ধারালো সমাজব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করেছি- যা সচেতন-অচেতন প্রতিটি মুহুর্তে আমাদের ঈমান আক্বিদা আর দৃষ্টিভঙ্গিকে বিকৃত ও কলুষিত করে চলেছে। ১৯২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফত তথা ইসলামিক রাষ্ট্রের বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে মুসলিম উম্মাহর জন্যে বিশ্বাস, মূল্যবোধ, তাহজিব-তামাদ্দুন রক্ষা করার আর কোন সমন্বিত ব্যবস্থাই থাকল না। একটি বিশাল উম্মাহর নেতৃত্ব বা সংকটে ও প্রান্তিকতায় কোন অভিবাবকই রইল না। এক দেহের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ একই প্রাণবিশিষ্ট উম্মাহ খন্ড বিখন্ডই হলো না, বরং এই উম্মাহ তার উম্মাহ হওয়ার যে চেতনা দ্বারা শাণিত ছিল তা-ই বিলুপ্ত হয়ে গেল!

মুসলিম জাতি ভুলেই গেল সে যে একটা অভিন্ন জাতি, উম্মাহ বলতে সে আর সেই উম্মাহ। সীমান্ত, হরেক পতাকা, দেশ আর জাতীয় সংহতি কোন কিছুই তাকে বিভক্ত ও ভিন্নতায় নিতে পারেনা যা সে উম্মাহ হওয়ার দ্বারা অর্জন করেছে। দেশ ও সীমান্তের তফাৎ তাকে কখনোই আলাদা করতে পারে না এবং সে কখনোই সুখী হতে পারেনা যখন সে দেখে দেশ ও সীমান্তের প্রাচীরের নামে জেলখানাগুলোতেও অপর মুসলিমরা লাঞ্চিত নির্যাতিত আর নির্মম নিপীরণের শিকার হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে কিংবা ভিন দেশীয় বলে নীরব গণহত্যা চালাচ্ছে। *এভাবেই প্রতিটি দেশ ও সীমান্তের ভেতরে ক্রুসেডার ও তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী মোনাফিক্বরা মুসলিমদের নিষ্পেষিত করে যাচ্ছে, আর শুধুই নিজ দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে একজন মুসলিম চুপ করে থাকে এবং ন্যূনতম সমব্যথিতও হয় না। কারণ তার উম্মাহ হওয়ার চেতনা বিলুপ্ত করা হয়েছে। সীমান্ত আর দেশ, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে তাকে মুসলিম উম্মাহ থেকে ছিটকে দেওয়া হয়েছে।*

আমি এ বিষয়টা নিয়েই কথা বলতে চাচ্ছি। এটি সেই অন্ধকার, এটিই সে তুফান আর এটিই সে মুসীবত যার কারণে অতীতের সব বিপদ আর সংকট ছাপিয়ে সে এমন এক সংকটে উপনীত হয়েছে যার পর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। আমি খিলাফাত বিলুপ্তির বিষয়টির কথাই বলছি।

মাত্র অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে পুরো উম্মাহ তার ইতিহাস, ঐতিহ্য, চেতনা, বিশ্বাস, বিজয়গাঁথা আর প্রাণবন্ত থাকার যাবতীয় উপকরণ হারিয়ে বসেছে। বিশ্বাস বলতে তার আর কিছুই থাকেনি, একটি নিথর খোলস ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই। আর এই একটি কারণেই ১৪০০ বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় যা অক্ষত ছিল, যা নিয়ে সে স্পন্দিত হতো সেই উম্মাহ দুটি প্রধান ও সর্বনাশা বিপদে আক্রান্ত হয়।

একদিকে সে দিকে দিকে লাঞ্ছিত নির্যাতিত হতে থাকে, মুসলিম ভূখন্ডগুলো ইহুদী নাসারায় ছেয়ে যেতে থাকে, সভ্যতা বিধ্বংসী যুদ্ধ ছাপানো হয় তাবৎ উম্মাহর ভূমিতে। হারাতে থাকে বিশাল ভূখন্ডগুলো। কাফেরদের জন্যে চিরদিনের জন্যে হারাম জাজিরাতুল আরবে এমনকি দাওলাতুর রাসুল (সা.) সৌদি আরাবেও কাফেররা সেনা ক্যাম্প করে। এমনকি মুসলিমদের অস্তিত্বের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যার ব্যাপারে বলা হয়েছে যতদিন মুসলিমরা আল্লাহর নির্দেশিত পথে থাকবে ততদিন সেই মহান ভূমি মুসলিমদের করতলগত থাকবে। যার জন্যে আজীবন সংগ্রাম করেছিল নুর আদ দ্বীন আল জঙ্গী *(রহিঃ)*, সালাহ আদ দ্বীন আল আইউয়ুবী *(রহিঃ)*। এক সমুদ্র রক্তের বিনিময়ে যে পবিত্র ভূমি তারা নাপাক নাসারাদের থাবা থেকে মুক্ত করেছিল। সেই ফিলিস্তিন আর ফিলিস্তিনের সেই ঘর যা মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলাহ, মাসজিদ আল আক্বসা পর্যন্ত হারাতে হয়। নামকাওয়াস্তে খিলাফাতের আনুষ্ঠানিক পতনের মাত্র দুই যুগের মধ্যে ফিলিস্তিন ইহুদীদের দখলদারিত্বের শিকার হয়, আর বাইতুল মুক্বাদ্দাস নাপাক ইহুদিদের হাতে লাঞ্ছিত ও অপবিত্র হয়। নিষিদ্ধ হয় মুসলিমরা সেখানে সিজদা করার ক্ষেত্রে। অথচ তাবৎ দুনিয়ায় তখনো ১৫০ কোটি মুসলিম। আর কোটি পেরোনো গ্র্যান্ড মুফতী, পূর্ব পশ্চিমে ছড়িয়ে থাকা মুসলিম নামধারী মুসলিম রাষ্ট্রের মিলিয়ন মিলিয়ন সৈন্য, উন্নত অস্ত্র, নিক্ষেপযোগ্য পারমাণবিক বোমা, ওয়ার ক্রাফট আর সমরাস্ত্র সবই ছিল। শুধু ছিল না একটি ইসলামিক রাষ্ট্র। মুসলিমদের জড়ো করার জন্যে একটি পতাকা, আর সম্বিত ফিরে আসার মত একটি নেতৃত্ব। *ফলে আজ ফিলিস্তিনে ইহুদী জেনোসাইড, আফগানিস্তানে, ইরাকে আমেরিকান তান্ডব, কাশ্মিরে হিন্দুদের অবর্ণনীয় নিপীড়ন আর চলমান মুসলিম নিধন, পূর্ব তিমুরে নাসারাদের মুসলিমদের ছলে বলে কৌশলে ধর্মান্তরিত আর চীনের তুর্কীদের (জিনজিয়াং প্রদেশের নৃতাত্ত্বিক মুসলিম) উচ্ছেদ অভিযানের অংশ হিসেবে প্রায় ৫০ বছরে ৪৫ লক্ষ তুর্কী মুসলিম হত্যা (রেফারেন্স: রিসার্জেন্স), মিয়ানমারে প্রাণী হত্যা মহাপাপের গৌতম বুদ্ধের অনুসারীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে রোহিঙ্গা মুসলিমদের যুগের পর যুগ ধরে করে আসা গণহত্যা, বাংলাদেশে আলিম উলামাদের কণ্ঠরুদ্ধ করা আর ৫ই মে গভীর নীশিতে চালানো গণহত্যার শিকার হলেও কিছুই করার ছিল না আর কিছু করাও যায়নি! শুধু একটি ইসলামিক খিলাফা বা নিধেনপক্ষে ইসলামিক ইমারাহও না থাকার অনিবার্য ফলই হল আজ যা এই উম্মাহ অতিক্রান্ত করছে।*

দ্বিতীয় সমস্যাটি আরো প্রকট ও ভয়াবহ যার ফলে মুসলিমদের জন্যে ইসলাম এর বিষয়টিতে আর কিছুই থাকেনি। তারা পুরোপুরি ইসলাম বিমুখ হয়ে পড়ে এবং যারা এখনো ইসলামের শাশ্বত

দিকটি হৃদয়ে ধারণ করে তাদেরও বাধ্য করা হয় ইসলাম থেকে বের হয়ে যেতে যদিও তারা আদতেই না জানুক তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে আছে! ফলে একদিকে গোটা উম্মাহ ছিন্নমূল হয়ে পড়ে অপরদিকে উম্মাহর অংশ প্রতিটি ব্যক্তিও পথহারা হয়ে ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে যায়, ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ে থেকেও এরা মূলত বেঈমান ও মুরতাদ হয়ে গিয়েছে। মাসজিদে আল্লাহকে সিজদা করলেও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিন্ন রব্ব গ্রহন করে নিয়েছে। এমনকি প্রাত্যহিক জীবনে যারা প্রতিনিয়তই কুফুরী করে চলে যদিও তারা আল্লাহ ও তার রাসুলের অনুসারী মনে করেনা কেন!

অপরদিকে, একটু ভেবে দেখুন, মুসলিম জাতি ভেঙ্গে গেছে, বন্যার পানির স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মতোই সে আজ সভ্যতার আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে- এই কঠিন বিপদে সাধারণ মুসলিমরা ধৈর্য্য ধরবে, যে কোন মূল্যে ঈমানকে বাঁচাবে, ইসলামকে হৃদয়ে ধারণ করবে, আগত বংশধরদের ইসলামের শাশ্বত মহিমার কথা পৌঁছাবে, নেতিয়ে যাওয়া জাতিকে জাগানোর কুশেশ করবে - এটাইতো কাম্য, তাই না?

কিন্তু উম্মাহ, মুসলিম যে একটি জাতি, বাঁচতে হলে জাতি হয়েই বাঁচবে, মরলে জাতি থেকেই মরবে - এই চেতনা হারানোর সাথে সাথে সে হারিয়ে ফেলল তার মুসলিম পরিচয়ও। হ্যা আলবৎ! সে ইসলাম যে জীবনের একমাত্র পথ, এই বোধটুকুও নিজের মাঝে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। ফলে কালিমার পরিচয় ভুলে সে হয়ে গেল দেশ, ভাষা, সীমান্তের ভিত্তিতে পরিচয়ধারী, গণতন্ত্রের অনুসারী। নিজেকে মুসলিম মনে না করে সে নিজের পরিচয় ধারণ করেছে আরবী, পাকিস্তানী, বাঙ্গালী। বর্ণের ভিত্তিতে সে আজ শেতাঙ্গ বা নিগ্রো। যে জীবন তার রবের দেওয়া, যে দুনিয়া তার রবের সৃষ্টি, যে আয়োজন আজ তাকে ঘিরে তার রবের, সে আমি আজ ভুলে গেছি আমার রব্বকে। **-সৃষ্টি যার বিধান চলবে একমাত্র তার [আল কুরআন]-** রবের এই বাস্তব ও দৃঢ় ঘোষণার পরও আমরা আমাদের জীবনে স্রষ্টার বিধান ছেড়ে নিজেদের মানব রচিত বিধান কায়েম করেছি। নিজেরাই নিজেদের বিধানদাতা হয়ে মহান রবের সাথে কুফরী করছি। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন- **যারা আল্লাহর বিধান ছাড়া বিচার করে তারা কাফের [আল কুরআন]।**

আজ পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে মুসলিমরা মানব রচিত আইন দিয়ে মানুষদের শাসন করছে। আল্লাহর গ্রন্থ, উম্মাহর উলামা-উমারা বিদ্যমান থাকার পরও মুসলিমরা আজ আল্লাহর কালাম ছেড়ে মানুষের নিজেদের রচিত সংবিধান দিয়ে শাসিত হচ্ছে। এক শ্রেনীর নামধারী মুনাফিক্ব মুসলিম, যারা কখনো আল্লাহকে পরিপূর্ণ ইলাহ হিসেবে মেনে নেয়নি, যাদের অন্তর ঈমান ও ইসলাম থেকে খালি, যারা মুসলিমদের সাথে থাকে, আর ইসলামকে নিজের ধর্ম বলে- অথচ তারা ইসলামের শত্রু কুফফারদের বন্ধু অতঃপর প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে গাদ্দারী করেই এরা ক্ষ্যান্ত হয়নি, এরা নিজেরাই *"নিজেদের বিধানদাতা ঘোষণা করল,*

নিজেদের মনমতো আইন রচনা করল। ইসলামকে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ কায়েম করল (নাঊজুবিল্লাহ্) , নাস্তিকতার প্রসার ঘটাল, জনগন রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস শ্লোগান দিয়ে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে স্পষ্ট কাফেরে পরিণত হল। এরা, এই গণতন্ত্রের অধিপতিরা, সংবিধান বিশেষজ্ঞরা, আইন প্রণেতাগণ, সাংসদ- এরা স্পষ্ট কাফের। এরা আল্লাহর কালিমাকে ছুঁড়ে ফেলেছে, বিধানদাতা হিসেবে আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের নির্বাচিত করেছে, ইসলামের স্থলে নাস্তিকতা নিয়ে এসেছে, জিহাদকে অস্বীকার করেছে।

এভাবেই তার নিজেরা নিজেদেরকে রব্ব ঘোষণা করে যমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ যা হালাল করেছে তারা তা হারাম করেছে। আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তারা তা হালাল করেছে। জনগন সকল ক্ষমতার উৎস এই বুলিতে অথবা শুদ্ধ ইসলামিক জ্ঞান ও আক্বীদার শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট করায় মুসলিমরা এর প্রতিবাদ করছে না, এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। খুব সহজেই এসব স্পষ্ট কুফরী বিষয় সমর্থন করছে, সহায়তা করছে, এসব গোমরা শাসকদের ক্রীড়ানকে পরিণত হচ্ছে। অথচ ইসলাম ধর্মে অন্যতম মৌলিক নীতিমালা হচ্ছে- *"অল্লাহ যা বৈধ করেছেন তা অবৈধ করা বা আল্লাহ যা অবৈধ করেছেন তা বৈধ করা কুফরী। এবং যে এ ধৃষ্টতা দেখাবে সে কাফের।"*

সুতরাং গণতন্ত্র, সেকুলারিজম, পুঁজিবাদ ও জাতীয়তাবাদের আশ্রয় নিয়ে যারা এইসব কুফরী করে তাদের শুধু এই জন্যে নিবৃত করা যায় না যে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র এবং একজন ইমাম নেই মুসলিমদের জন্যে। যে তাদের জান, মাল,ইজ্জত আব্রু, ঈমান আক্বীদা বিশ্বাস সুরক্ষিত রাখবে। যাবতীয় ভ্রষ্টতা ও বিকৃতি থেকে ইসলামকে হেফাজত করবে। যে কোন দুর্দিন ও বিপর্যয়ে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ রাখবেন, প্রতিরোধ করবেন। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করবেন। সকলের মাঝে আদল ও ইনসাফ ক্বায়েম করবেন। আফসোস! শুধু ইসলামিক শাসনব্যবস্থা এবং ইমাম না থাকায় ইসলাম ও মুসলিমরা আজ এত বড় বিপর্যয়ের মুখোমুখি।

তারা গণতন্ত্রকে জীবনের পথ, শান্তি, সফলতা, জয় পরাজয়, উন্নয়নের জন্যে বেছে নিয়েছে। তারা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বাস্তবায়নের কথা বলে। ওয়ার্ড মেম্বার থেকে রাষ্ট্র প্রধান পর্যন্ত তারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচন করে। গণতন্ত্র এমন মানুষদের নির্বাচন করে যারা ঐ সমাজের সবচেয়ে চতুর, দুষ্ট, বিত্তশালী, জালিম, অন্যের ওপর আধিপত্য ক্বায়েমকারী, দুর্নীতিবাজ। যাদের রাজনীতি ও নির্বাচনের প্রধাণ উদ্দেশ্যই থাকে নিজের আখের গোছানো, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভোগদখল, জনগনের সম্পদ আত্মসাৎ, নিজের দল ও কর্মীদের অবাধ সুযোগ দান ও স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা, সাধারণ জনগণের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করা, স্থানীয় বাজার ও হাঁটের ওপর দখলদারী ও অবৈধ টেন্ডারবাজী করা। বিশেষ করে এই শাসকশ্রেণী হয় এমন এক দল লোক যারা জীবনে কখনোই তার রব্বের অনুগত নয় এবং ধর্মীয় অনুশাসন অমান্যকারী। কেননা এখানে কোন সাধু ধার্মিক ব্যক্তি টিকতে পারবে না, যেখানে আধিপত্যের সিস্টেমটাই এমন, জোর যার মুল্লোক তার, অথবা পরকাল নয়, দুনিয়ায় তোমার বেহেশ্ত অথবা এমন এক শ্রেণী যারা পরকালের কথা

জীবনে ভাবতেও শিখেনি। তাই আপনি কখনো এখানে ধার্মিক, খোদাভীরু নেতৃত্ব পাবেন না। আর যাকে পাবেন সে এমন কেউ, যে জীবনের লক্ষ্যই বুঝে কেবল আধিপত্য, ভোগদখল আর ক্ষমতা। এটাই বাস্তবতা। আর আমি এই কথা গবেষণা করে বলছিনা। এ আপনাদের চোখের সামনে ঘটছে। এমনকি আপনার ইউপি থেকে সরকার প্রধান, প্রতিটি স্তরে তাকালেই বুঝতে পারবেন। আপনার যদি বিবেকের কিঞ্চিত জাগ্রত থাকে তবে আপনি সমস্যা আরো গভীর থেকে বুঝতে পারবেন, আর জেনে থাকবেন আপনি একটা নাস্তিক্যবাদী, বস্তুবাদী দুনিয়ায় বাস করছেন, যেখানে ভালো ও ধর্মীয় নেতৃত্ব আপনি আশাই করতে পারেন না। যেমন আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোথাও হয় নি।

এরা আপনাকে যাবতীয় উপাসনা ও ধর্মীয় রীতি পালন করার স্বাধীনতা দেয়। আপনি ভেবেছেন তারা তো ইসলামবান্ধব। আশ্চর্য! শুধু এদের মিডিয়া, আর আপনার চিন্তাশক্তির পঙ্গুত্বের কারনেই আপনি এমনটি ভাবতে পেরেছেন। আপনি কি দেখেন না, এরা মদকে বৈধতা দিয়েছে, মদের লাইসেন্স দিচ্ছে, পতিতালয়ের লাইসেন্স দিয়েছে! দেখেছেন? এরা কি স্পষ্ট কাফের নয়? এরা যদি জন্মগত কাফের হতো আর এদের নাগরিক ও রাষ্ট্র যদি কাফের রাষ্ট্র হতো তবে আমি কিছুই বলতাম না। কিন্তু এরা মুসলিম দাবীদার ও ইসলামের দোহাই দিয়ে শাসন করছে, আপনাকে তাদের আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ করছে। কিন্তু এখানে আপনার ঈমান, আক্বীদা জড়িত, যা আপনাকে হয় বিশ্বাসী না হয় অবিশ্বাসী বানাবে। হয় জান্নাত নয় জাহান্নামে নিয়ে যাবে। ভেবেছেন কখনো? কি হবে আপনার! এরা সুদকে রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান করে নিয়েছে। এমনকি সুদ ব্যতীত কোন লেনদেন-ই অনুমোদিত নয়। আপনি কি জানেন যারা সুদের সাথে সম্পৃক্ত; স্বাক্ষী, লেখক, সুদদাতা বা গ্রহীতা হোক, সে মায়ের সাথে যীনাকারী। আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণাকারী। আর যারা শুধু সুদী কারবার করেই ক্ষান্ত নয়, বরং সুদকে বৈধতা ও বাধ্যতামূলক করেছে তারা কি? হ্যা, ঠিক ধরেছেন, তারা কাফির। চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

আপনি কি দেখেননা, এরা পর্দার ওপর নিষেধাজ্ঞা করেছে, পিতামাতাকে সন্তানের জন্যে পর্দার ব্যাপারে বলতে বারণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ্যে পর্দারক্ষাকারী ছাত্রীকে বের করে দেওয়া হচ্ছে, কখনো টেনে তার বোরকা খুলে ফেলার ধৃষ্টতা দেখানো হচ্ছে, প্রকাশ্যে মন্ত্রী পর্যন্ত টিভিতে বলছে- বোরকা আরব্য পোষাক, কোন বাঙ্গালী নারী এ পোষাক পড়তে পারে না (!)। আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অমান্য করে তারা সম্পদে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে চায়। এসবই তাদের গাল-গপ্প!

তারা এমন সব মানুষদের সুরক্ষা দেয়, যারা আল্লাহ, রাসুল (সা.), আখিরাতে অবিশ্বাসী। এবং আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.) এর নামে কটুক্তিকারী। রাসুল (সা.) এর সম্মানীতা স্ত্রী মুসলমানদের মা উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের প্রতি অপবাদ আরোপ ও গালাগাল করে। বাক স্বাধীনতার কথা বলে শাসক শ্রেণী তাদের অপরাধ আড়াল করে। আপনি কি বুঝতে চেষ্টা করবেননা যে, এই শাসকরা

যদি এসব কাজ ও কথা বলে তবে তারা সমর্থন হারাবে, তাই তারা তাদের নাস্তিক স্যাকুলার অনুসারীদের দিয়ে এসব করাচ্ছে। মূলত এগুলো ক্ষমতা কুক্ষীগতকারীদেরই অভিব্যক্তি, এটা হল সেই মিশন, যা শয়তান ও কাফেররা ইসলামের বিপক্ষে বাস্তবায়ন করতে চায়।

আপনি এদের রচিত সংবিধানের আনুগত্য করছেন, অথচ আপনার রব্ব আল্লাহ। আল্লাহ আপনার জন্যে বিধান দিয়েছেন। আপনি এই বিধান মানা ও প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই মুসলিম থাকবেন। নতুবা মুখে আল্লাহকে রব্ব বলে বিধান ও হুকুমের ক্ষেত্রে অন্যের আনুগত্য করলে আপনি মূলত কার গোলামি করলেন? অবশ্যই আপনার শাসকদের। যার কারনে আপনি কিছু আমলের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম মানলেও মূলত শাসকদের কুফরী বিধানের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আপনি দলগতভাবে কাফেরে পরিণত হলেন। আপনি কি জানেন কাফের কে? যে অস্বীকারকারী, গোপনকারী সেই কাফের!

আমি মূলত ২য় বিপর্যয় ও ক্ষতির দিকটি আলোচনা করছি। বলেছিলাম যা মূলত প্রতিটি মুসলিকে শেষ পর্যন্ত সর্বহারা করে দিয়েছে। ঈমান, আক্বীদা, মূল্যবোধ হারিয়ে সে আজ দিশেহারা। অচিনপুরের কেউ। সে আজ ভিন্ন পরিচয়ের, ভিন্ন নামদারী কেউ। মুসলিম নয়। ঈমান আছে মনে করেও বহুবিধ কুফরীর কারনে সে আজ দ্বীনহারা, ঈমানহারা...!

এসব শাসকরা এমন এক শাসনব্যবস্থার অবতারণা করেছে যা শুধু নির্বাচনের একটি নিয়মের মধ্যেই সীমিত রইল না, বরং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সে অংশগ্রহণ করল। পরিবার থেকে রাষ্ট্র, প্রতিটি সিংগল মানুষের জীবনে সে এক অবশ্য পালনীয় নীতিমালা নিয়ে এসেছে। এই গণতন্ত্র এসেই সে নিজেকে ইসলামের পরিপূরক হিসেবে উপস্থাপন করল। প্রতিজন ইসলামের অনুসারীকে সে নিজের প্রণীত জীবন ব্যবস্থায় নিয়ে আসতে তৎপর হল। এক কথায় সে এক স্বতন্ত্র জীবনব্যবস্থা হিসেবে আবির্ভূত হল। কিছু কর্ম আর মৌখিক স্বীকৃতি দিলেও জীবনধর্ম হিসেবে গণতন্ত্র বেছে নিয়েছে। অথচ এসব ক্ষেত্রে ইসলাম তার বিধান নিয়ে এসেছে এবং ইসলামকে উপেক্ষার দ্বারা সে ধর্ম হিসেবে ইসলামকে পূর্ণ না মানার সাক্ষ্য বহণ করে। প্রতীয়মান হয়ে যায় ইসলাম জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের জন্যে প্রযোজ্য নয়, নাউজুবিল্লাহ্!

ইসলাম যেখানেই বিধান হয়ে এসছে সেখানেই গনতন্ত্র এসে হাজির হয়েছে। পাপ ও পূণ্যের যেমন তিরষ্কার ও বাহবা আছে এই নতুন দ্বীন গণতন্ত্রও তেমনি তার অনুগতদের পুরষ্কার আর আবাধ্যদের ভর্ৎসনা করে। প্রতি ক্ষেত্রেই! রাস্তায় হাঁটা থেকে শুরু করে জীবনের সব অনুষঙ্গসহ এমনকি দিবসের শুরু শেষেও আছে তার নিজস্ব পদ্ধতি! ইসলাম প্রতিটি কর্মেও জন্যে আইন প্রণয়ন করেছে, যা আল্লাহপ্রদত্ত। এমনিভাবে প্রতিটি অন্যায় কাজের শাস্তির বিধান করেছে ও তা নির্দিষ্ট করেছে। গণতন্ত্র এসে এসব প্রতিটি অপরাধের জন্যেই নিজস্ব আইন ও শাস্তি প্রণয়ন করেছে। সুতরাং, মুসলিম হয়েও আল্লাহপ্রদত্ত বিধান মোতাবেক বিচার ও শাস্তি বাতিল করে গণতান্ত্রিক বিচার ও

শাস্তি প্রয়োগ করা হয়। চুরি, যীনা, জুলুম, নেশা- প্রতিটি অপরাধের জন্যে তা নিজস্ব শাস্তি নিশ্চিত করেছে। সুতরাং এখনো বুঝতে বাকি আছে কি গণতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র ধর্ম! আফসোস, হক্ব ও বাতিল এত স্পষ্ট হওয়ার পরও আপনার বদ্ধ হৃদয় হক্বের জন্যে উন্মুক্ত হচ্ছে না!

আধুনিকতা, স্যাকুলারিজম, প্রগতিশীলতা আর বিজ্ঞানমনষ্কতা- যে নামে আর যে পদ্ধতিতেই হোক ঐ একই জীবনব্যবস্থার নানা উপকরণ আর ধাঁচ মাত্র। পাশ্চাত্যের কুফফার আর প্রাচ্যের মুসলিমদের জীবনব্যবস্থায় পার্থক্য আছে কি? সুতরাং ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রজীবন প্রতি ক্ষেত্রেই জীবনের ধর্ম হল গণতন্ত্র। যা এখন গর্ব আর একটি প্রকাশ্য বিষয়। প্রতিটি রাজনৈতিক দল গনতান্ত্রিক; ইসলামকে যেমন প্রতিষ্ঠা করতে হয় তেমনি এসব দলেরও একমাত্র লক্ষ্য থাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, গণতান্ত্রিক আইন, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক নির্বাচন ইত্যাদি বিষয় যা ছাড়া একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চলতে পারেনা- প্রমাণ করে জীবন ও রাষ্ট্রের নতুন ধর্ম হচ্ছে গণতন্ত্র। ইন্নালিল্লাহ্! একবারও ভেবেছেন আপনার অজান্তেই আপনি একটি নতুন ধর্মের অনুসারী হয়েছেন?

অথচ আল্লাহ বলেন, **"আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা" [আল কুরআন]**। এমনকি বাথরুমে প্রবেশ অথবা দাঁত পরিষ্কারের মতো ব্যক্তিগত বিষয়াবলিতেও ইসলাম তার দেওয়া বিধান অনুসরণ করতে ও শিক্ষা দিতে ছাড়ে না! ভেবেছেন? আপনি অপবিত্র, ইসলামিক পদ্ধতি মেনে গোসল না করলে আপনি কখনোই পবিত্র হবেন না! সুতরাং ছোট থেকে বড়, বিশেষ করে সামজিক বিষয়গুলিতে ইসলামিক বিধান মানা অপরিহার্য আর তা অস্বীকার করলে সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়। তাহলে গণতন্ত্রের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ মানবপ্রসূত ব্যবস্থার আনুগত্য তো কল্পনাই করা যায়না! যা কি না ইসলাম থেকেই বের করে নিয়ে যায়। আল্লাহ এ ব্যাপারে বলেন, **"যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করে তা কবুল করা হবে না, আর পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে [আল কুরআন]"**।

গণতন্ত্রের স্বরূপ বুঝার জন্যে তো এটুকুই যথেষ্ট যে এটি কাফেরদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, যা মুসলিমদের জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে না। এটি এমন এক শাসনব্যবস্থা, যা কিনা মুসলিম জাতি একটি উম্মাহ - এই চেতনা থেকে বঞ্চিত করেছে। জাতীয়তাবাদের নামে তাবৎ মানব সম্প্রদায়কে স্থানিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে সীমাবদ্ধ করে বিভক্ত করেছে। এভাবে গণতন্ত্রের প্রভুরা প্রতিটি দেশ ও জাতিকে শোষণ ও শাসন করছে। কিন্তু নিজ দেশ ও পরিমন্ডলের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে শোষিত জাতি কিংবা অপরাপর অভিন্ন ধর্মীয় জাতি তাদের সাহায্যে আসেনা বা আসতে পারে না - এটি তাদের বা আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার (!)। লজ্জা!

এটি তার সংবিধানে ইসলামকে বরদাশত করে না। এমনকি সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বা আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ আস্থা - লিখাগুলিও উঠিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর আর অনন্তর সে তার প্রতিটি

কাজে ইসলামকে অবজ্ঞা আর অস্বীকার করেও অবশেষে নামকাওয়াস্তে স্বীকৃতি- সংবিধান থেকে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা- উঠিয়ে দিয়েছে। ভাবুন, যারা আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা উঠিয়ে দেয়, তারা কি মুসলিম? সুতরাং তাদের চিনে নিন! আপনার মরিচা ধরা বিবেককে জাগ্রত করুন। এই সংবিধানে লিখিত মূলনীতির সাথে অন্য যে কোন কিছুর যতটুকু মিলবে ততটুকু গ্রহণীয়, আর যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ তা বাতিল। এই বিধান দিয়ে সে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বা তার অধিক বিধানকে বাতিল ও অগৃহীত করেছে। নীতিমালা অনুযায়ী সংবিধান বহির্ভূত কোন কাজ করা আইনত অপরাধ, যদিও তা কুরআনের আইন বা ইসলামের বিধান হোক। এ জন্যেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলিতে ইসলামকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করা হয়েছে।

গণতন্ত্রের অন্যতম আবিষ্কার ও উপাদন এই **জাতীয়তাবাদ** মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত ও টুকরো টুকরো করতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে। জাতীয়তাবাদের বিষ গোটা উম্মাহকে অচেতন আর উন্মাদ অপ্রকৃতিস্থ করে দিয়েছে। আমরা এখানে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করতে চেষ্টা করছি, না হলে গাজওয়াতুল হিন্দকে অনুধাবন করা যাবেনা। উপমহাদেশের যুদ্ধে দেশ-সীমান্তের বিভেদ আমায় ধোঁকায় ফেলে দেবে! তাছাড়া আমাদের উম্মাহ্ নিয়ে আলোচনায়ও এটি খুবই প্রাসঙ্গিক। মুসলিম জাতি এবং আলাদা করে প্রতিটি মুসলিম এই জাতীয়তাবাদের বিষ সাফার করছে।

সুতরাং গাজওয়াতুল হিন্দের বরপুত্র তারাই যারা গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদের মতো বিষবাষ্প ত্যাগ করে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করেছে! তাদের দ্বারাই **হিন্দুস্তান** ইসলামের আলোয় আলোকিত হবে! সুতরাং গাজওয়াতুল হিন্দের অগ্রসৈনিক হতে হলে সকল জাহিলিয়্যাহকে এখনই না বলুন। তাবৎ ত্বগুতকে অস্বীকার করুন। তাওহীদকে আঁকড়ে ধরুন। নিজের শেকড় ও শিখরকে দ্বীনের রজ্জু দ্বারা মজবুত করে নিন। তবেই গাজওয়াতুল হিন্দের দিকে আপনার প্রতিটি প্রয়াস সফলতার দিকে ধাবমান হবে।

তবেই এখন সময় হয়েছে। চলুন গাজওয়াতুল হিন্দ নিয়ে ব্যবচ্ছেদ অভিযান শুরু করি...

পট পরিচিতি

গাজওয়াতুল হিন্দ। হিন্দুস্তানের গাজওয়া বা যুদ্ধ-জিহাদ। নামটি হাদীসের ভাষা থেকে নেয়া। হিন্দুস্তান অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশ। ভারতীয় উপমহাদেশের এই চূড়ান্ত যুদ্ধকে রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামকরণ করেছেন "**গাজওয়াতুল হিন্দ**"।

গাজওয়াতুল হিন্দ নিয়ে আমরা উপমহাদেশের মুসলিমদের **দুইভাগে** ভাগ করতে পারি।

একভাগে অধিকাংশ মানুষ যারা ঘুমন্ত। যারা দ্বীন সম্পর্কে বিমুখ, ভোগ-বিলাসিতা আর পরিবার-ভবিষ্যত নিয়ে ব্যস্ত। তাদেরকে সত্য ও বাস্তবতা থেকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। যদিও তারা নিজেদের মুক্তমনা, শিক্ষিত, স্বাধীন আর বুদ্ধিদীপ্ত মনে করে। বস্তুত তারা হচ্ছে দ্বীনহীন, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এবং নিজেদের নবী ও ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন উদ্ভ্রান্ত জাতি। এরা ধর্মানুসারী হয়েও ধর্মের ন্যূনতম বিধি-বিধান অনুসরণ করেনা। এরা খড়কুটোর ন্যায়। প্রত্যেক শতাব্দীর উচ্ছিষ্টের মতোই এরা মানব সভ্যতা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ঝড়-ঝাপ্টা, অভাব-অনটন বা যুদ্ধ-বিগ্রহ যেভাবেই হোক এদেরকে লুপ্ত করা হয়। কেননা এরা শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন। আর মুসলিমদের শেকড় হচ্ছে তার দ্বীন। অতএব আজকে যখন সমাজের অধিকাংশ মানুষ নামাজহীণ, রোজাহীণ, গান-বাজনা, মদ-ব্যভিচার, অসভ্যতা-অশ্লীলতায় নিমজ্জিত তখন কি করে তাদের জন্যে কল্যাণ আশা করা যায়?
"**জলে স্থলে যত বিপর্যয়-ফাসাদ আসে তা মানুষের নিজ হাতের উপার্জন (আল কুর'আন)**"
অনন্তর আল্লাহ জিহাদের বিধান দানের পর প্রাকৃতিক আযাব দিয়ে কাউকে ধ্বংস করেন না। তিনি মু'মিনদের ওপর বিধিবদ্ধ করেছেন যে, তাদের হাত দিয়েই কাফির ও জালিমদের শাস্তি দিবেন

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। [সুরা তাওবা ৯:১৪]

তিনি একের দ্বারা অপরকে শায়েস্তা করেন। এবং এভাবেই তিনি মানব সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেন। সুতরাং আমরাও পরীক্ষিত হচ্ছি, হবো। আমাদের অধিকাংশের এই অলসতা, অবহেলা, অপসংস্কৃতির মুগ্ধতা, অন্যায়, অবিচার, অসামাজিকতা, অধার্মিকতা আর খোদাদ্রোহীতার ফলাফলে আল্লাহ আমাদের ঘাড়ে যেমন লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিয়েছেন। তেমনি শত্রু দ্বারা আমাদের শায়েস্তা করবেন। এটাই আসমানি বিধান। আর আমাদের শত্রু আমাদের উঠোন পেরিয়ে দুয়ারে করাঘাত করছে। তবুও যারা ঘুমিয়ে থাকবে তারা ধ্বংস হয়ে যাক। নিশ্চয়ই তারা পথভ্রষ্ট এক সম্প্রদায়।

আরেকভাগে আছে তাওহীদপন্থী, ধর্মপ্রাণ মুসলিম, ইসলামের হক্বপন্থী উলামা, একনিষ্ঠ মুজাহিদীনরা। যারা সত্য ও বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত এবং তারা আল্লাহর জন্যে কাউকে বন্ধু হিসেবে নিয়েছে এবং আল্লাহর জন্যেই কাউকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করেছে। এরাই দুনিয়া ও

ইসলামের কান্ডারি এবং রক্ষাকবচ। কাফেররা এদেরকে ভয় পায়। এরা সম্মান এবং আজাদি চায়। এরা যেমন ইবাদাতগাহে আল্লাহর একত্ববাদের পূজা করে তেমনি হাটে-মাঠেও আল্লাহরই বিধান পালন করে। এরা জীবন ও জন প্রতিক্ষেত্রেই আল্লাহকে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং সমস্ত সৃষ্টির বিধান ছুঁড়ে ফেলে ওহীর বিধান আঁকড়ে ধরেছে। এরাই শয়তান ও ত্বগুতের প্রধান ও প্রকাশ্য শত্রু। কুর'আনের ভাষায় এরাই "**হিজবুল্লাহ্**"। আল্লাহর সৈনিক। আল্লাহর দল। এরাই আল্লাহর খলিফা। আল্লাহ শুধু এদের এবং শুধুই এদের অভিভাবক। এবং সমাজে এদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প থাকে। হাদীসের ভাষায় এরা হল "**গুরাবা**"। যার অর্থ হল অপরিচত। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) "গুরাবাদের" জন্যে সুসংবাদ দিয়েছেন। ফা-তুবা-লিল-গুরাবা।

কাফেরদের মনোরঞ্জন এদের ব্রত নয়। এরা শীশা ঢালা প্রাচীরের ন্যায়। এদের মতোই একদা একদল লোক ছিলেন, যারা গ্রাম্য, অশিক্ষিত, বেয়াড়া জাতি ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করে তারা আল্লাহর দলে যোগ দিয়েছিলেন। এদের সাহাবা বলা হয়। তারাই ইসলামকে বিজয়ী করেছিলেন, প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সম্মান ও গৌরবের একচ্ছত্র অধিকারী হয়েছিলেন । রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম। তাদের অনুসারীগণ আজকের গুরাবারাও পুনরায় সম্মান, গৌরব ও বিজয় ফিরিয়ে আনবে। আল্লাহর যমীনে কোন বাতিল, মুশরিক, শাতিম, জালিম থাকতে পারেনা। অবশ্যই আজকের উগ্রবাদী গুরাবারা আগামীর বিজয়ী সিপাহসালার। সেদিন তাদেরকে সাহাবাদের গৌরবময় উত্তরাধিকারী বলা হবে। যদিও আজ তারা বিতাড়িত ও নিপীড়িত। অনন্তর সাহাবাদের পদাঙ্কানুসারীদের দেখ। তারা কতটা বীরদর্পে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করছে। তাদের জীবনে দেখ ইসলাম ভিন্ন কিছুই নেই। তাদের থেকেই হবে, যারা হিন্দ বিজয় করবে! আল্লাহ এদের ভালোবাসেন। এরাই ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামকে বিজয়ী করতে চায় এবং হিন্দু-মালাউনদের পা চাটার বদলে তাদের ঘাড়ে লাঞ্ছনা চাপিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

গাজওয়াতুল হিন্দের মূল্যায়ন

পরিতাপের বিষয় এই সমস্ত তাওহীদপন্থী মুসলিম, মুজাহিদীনদের অধিকাংশই আবার গাজওয়াতুল হিন্দ নিয়ে আছে কল্পনায়, অজ্ঞতায়। অধিকাংশই জানেনা কেমন হবে গাজওয়াতুল হিন্দ। কারা কারা অংশ নিবে এই যুদ্ধে। কে কেন অংশ নিবে! কিভাবে প্রস্তুত করবে নিজেকে! কবে এবং এর বিস্তৃতি ও বিশালতা কত। জানলেও তা বাস্তবতার সাথে যায় না। **অনেকেই মনে করে মুষ্ঠিমেয় মুজাহিদীনদের সাথে ভারতের যুদ্ধই গাজওয়াতুল হিন্দ!**

কিন্তু না। বরং এর চেয়েও বেশি ও ভয়ঙ্কর। মূলত গাজওয়াতুল হিন্দে মুজাহিদীনরা একটা ছোট্ট অংশ হিসেবে থাকবে (যদিও যুদ্ধের কলকাঠি তাদের হাতেই ন্যস্ত হবে) এবং এই যুদ্ধ ধারণার চেয়েও আরও বিস্তৃত থাকবে। তাই কেমন হবে গাজওয়াতুল হিন্দ জানতে আমাদের এই আলোচনা। ইনশাআল্লাহ এতে গাজওয়াতুল হিন্দ (ভারতের যুদ্ধ) কেমন হতে পারে ব্যাখ্যা করা হবে। ওয়ামা তৃাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ্।

ইসলামের যুদ্ধকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১) গাজওয়া ও ২) সারিয়া

যে যুদ্ধ-জিহাদে রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে অংশগ্রহণ করেছেন তাকে **গাজওয়া** বলে। এবং যে যুদ্ধ-অভিযানে তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অংশগ্রহণ করেননি তাকে **সারিয়া** বলে। **সুতরাং গাজওয়া’ রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্যে খাস ও একটি বিশেষ পরিভাষা। যুদ্ধ-জিহাদের এক বিশেষ মাক্বাম।**

রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভারত অভিযান ও বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। এটি ছিল একটি **ভবিষ্যদ্বাণী**। এটি ছিল একটি মু'জিজা। আর এই অভিযান-যুদ্ধ যখন হবে তখন তিনি দুনিয়াতে থাকবেন না তিনি জানতেন। সুতরাং এই যুদ্ধ সারিয়া হওয়ার কথা। অথচ তিনি এই যুদ্ধের নাম দিয়েছেন গাজওয়া- **'এমন যুদ্ধ যে যুদ্ধে স্বয়ং নবীজি উপস্থিত থাকেন'**।

এটি একটি সম্ভাষণ, গুরুত্বের প্রাধান্য ও মর্যাদার মূল্যায়ন। এ যুদ্ধ যেন এমন, **যারা এই যুদ্ধে শরীক হবেন তারা যেন নিজেদের সাথে রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পেলেন**। **সুবহানাল্লাহ্!**

যুদ্ধটির নাম গাজওয়া হওয়ার সম্ভাব্য আরো কারণ থাকতে পারে। যেমন এটি মুশরিক/মালাউনদের সাথে মুসলিমদের চূড়ান্ত যুদ্ধ। যুদ্ধের প্রচন্ডতা, পরিবেশ, মুসলিম ও মুশরিকদের বৈষম্যমূলক অবস্থান, আখেরুজ্জামান, ঈমানদারদের স্বল্পতা, কঠিন পরীক্ষা, চূড়ান্ত বিজয়সহ ভারতীয়

উপমহাদেশকে সার্বিকভাবে শিরকের মূলোৎপাটনের মাধ্যমে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করার কারণেও হতে পারে।

একটি হাদীসে এসেছে- "**হযরত সাওবান (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) কে বলতে শুনেছেন যে রাসুলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ হিন্দুস্তানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, "অবশ্যই আমাদের একটি দল হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ সেই দলের যোদ্ধাদের সফলতা দান করবেন, আর তারা রাজাদের শিকল/বেড়ি দিয়ে টেনে আনবে এবং আল্লাহ্ সেই যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন (এই বরকতময় যুদ্ধের দরুন) এবং সে মুসলিমেরা ফিরে আসবে তারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আলাইহি'ওয়াসাল্লাম) কে শামে (সিরিয়া) পাবে।"**

সুতরাং "গাজওয়াতুল হিন্দ" হল ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমদের ভারতের মালাউনদের বিপক্ষে চূড়ান্ত ভবিতব্য যুদ্ধ যেখানে মুসলিমরা বিজয়ী হবে। হাদিসে বর্ণিত '**হিন্দ/হিন্দুস্তান**' হল অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশ যা গ্রেটার খোরাসানের কিছু অংশ, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, বার্মা ও শ্রীলঙ্কা নিয়ে গঠিত।

এই যুদ্ধটি হবে মুসলমানদের সাথে মুশরিক মূর্তিপূজারি হিন্দুদের যুদ্ধ। মূলত আমরা যাদের হিন্দু বলে জানি- তারা হিন্দু নয় এবং তাদের ধর্মেও নামও **হিন্দু** নয়। তাদের ধমের্র নাম হল **সনাতন ধর্ম** এবং আজকের হিন্দুরা হল ধর্ম পরিচয়ে **সনাতনি**। আর হিন্দুস্তানের অধিবাসী হিসেবে সবাই হিন্দুস্তানি বা হিন্দু যেমন বাংলাদেশের/বঙ্গের অধিবাসি হিসেবে বাংলাদেশি/বঙ্গীয়। সুতরাং সে হিসেবে আমরা সবাই হিন্দু। আমরা হিন্দের অধিবাসি।

হিন্দুস্তানের এই ভবিতব্য যুদ্ধটি সম্পর্কে রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার পবিত্র জবান থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আমরা সেই যুদ্ধের রূপরেখা অথবা কেমন হতে পারে সেই যুদ্ধ- তা আলোচনার পুর্বে কয়েকখানা হাদিস দেখে নেই...

১) আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

"আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের থেকে হিন্দুস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। কাজেই আমি যদি সেই যুদ্ধের নাগাল পেয়ে যাই, তাহলে আমি তাতে আমার জীবন ও সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে ফেলব। যদি নিহত হই, তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হব। আর যদি ফিরে আসি, তাহলে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরায়রা হয়ে যাব"। (সুনানে নাসায়ী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪২)

২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হিন্দুস্তানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন,

"অবশ্যই আমাদের একটি দল হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ সেই দলের যোদ্ধাদের সফলতা দান করবেন, আর তারা রাজাদের শিকল/বেড়ি দিয়ে টেনে আনবে । এবং আল্লাহ্ সেই যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন (এই বরকতময় যুদ্ধের দরুন)। এবং যে মুসলিমেরা ফিরে আসবে তারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) কে শাম দেশে (বর্তমান সিরিয়ায়) পাবে"।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, "আমি যদি সেই গাজওয়া পেতাম, তাহলে আমার সকল নতুন ও পুরাতন সামগ্রী বিক্রি করে দিুাম এবং এতে অংশগ্রহণ করতাম । যখন আল্লাহ্ আমাদের সফলতা দান করতেন এবং আমরা ফিরতাম, তখন আমি একজন মুক্ত আবু হুরায়রা হতাম; যে কিনা সিরিয়ায় হযরত ঈসা (আঃ) কে পাবার গর্ব নিয়ে ফিরত । ও মুহাম্মাদ (সাঃ)! সেটা আমার গভীর ইচ্ছা যে, আমি ঈসা (আঃ) এর এত নিকটবর্তী হতে পারতাম, আমি তাকে বলতে পারতাম যে আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর একজন সাহাবী"। বর্ণনাকারী বলেন যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মুচকি হাসলেন এবং বললেনঃ 'খুব কঠিন, খুব কঠিন'। (আল ফিতান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০৯)

৩) হযরত সাফওয়ান বিন উমরু (রাঃ), তিনি বলেন কিছু লোক তাকে বলেছেন যে রাসুল (সাঃ) বলেছেনঃ "আমার উম্মাহর একদল লোক হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ তাদের সফলতা দান করবেন, এমনকি তারা হিন্দুস্তানের রাজাদেরকে শিকলবদ্ধ অবস্থায় পাবে। আল্লাহ্ সেই যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন। যখন তারা সিরিয়ায় ফিরে যাবে, তখন তারা ঈসা ইবনে মারিয়ামকে (আঃ) এর সাক্ষাত লাভ করবে"। (আল ফিতান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১০)

হাদিসগুলো খুবই স্পষ্ট। হিন্দুস্তানের অধিবাসিদের জন্যে শিহরণ জাগানিয়া যে - রাসুলে আরাবি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিয়ে আলোচনা করেছেন, আমাদের হিন্দের নাম হাদীসে এসেছে এবং আমাদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন! এই যুদ্ধের মর্যাদা ও গুরুত্ত্ব অনুধাবন করে আবু হুরায়রা (রাঃ) কি বলেছেন? তিনি আকাঙ্ক্ষা করে বলেছেন- "আমি যদি সেই গাজওয়া (গাজওয়াতুল হিন্দ) পেতাম, তাহলে আমার সকল নতুন ও পুরাতন সামগ্রী বিক্রি করে দিতাম এবং এতে অংশগ্রহণ করতাম । যখন আল্লাহ্ আমাদের সফলতা দান করতেন এবং আমরা ফিরতাম, তখন আমি একজন মুক্ত আবু হুরায়রা হতাম; যে কিনা সিরিয়ায় হযরত ঈসা (আঃ) কে পাবার গর্ব নিয়ে ফিরত । ও মুহাম্মাদ (সাঃ)! সেটা আমার গভীর ইচ্ছা যে আমি ঈসা (আঃ) এর এত নিকটবর্তী হতে পারতাম, আমি তাকে বলতে পারতাম যে আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর একজন সাহাবী"। বর্ণনাকারী বলেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মুচকি হাসলেন এবং বললেনঃ 'খুব কঠিন, খুব কঠিন'। (আল ফিতান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০৯)

এই হাদিস থেকে বুঝা যায় যারা এই যুদ্ধে ইসলামের পক্ষে অংশগ্রহণ করবে তারা বিজয়ী হলে জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং মৃত্যুবরণ করলে শ্রেষ্ঠ শহীদ হবে । সুবহানাল্লাহ্। এই যুদ্ধে মুজাহিদীনদের প্রতি আল্লাহর করুণা ও মাগফিরাতের নমুনা বর্ণনা করতে গিয়ে নবীজি (সা.) ঈসা

('আলাইহিস ওয়াসাল্লাম) এর বাহিনীর সাথে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন- **"আমার উম্মতের দুটি দল এমন আছে, আল্লাহ যাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ করে দিয়েছেন। একটি হল তারা, যারা হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আরেক দল তারা যারা ঈসা ইবনে মারিয়ামের সঙ্গী হবে"। (সুনানে নাসায়ী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪২)**

গাজওয়াতুল হিন্দ কখন হবে?

সুতরাং এই যুদ্ধ একটি সুনির্ধারিত, সুনির্দিষ্ট, ও প্রতিশ্রুত চূড়ান্ত যুদ্ধ। ভারতের সকল যুদ্ধই যেহেতু আম ভাবে গাজওয়াতুল হিন্দ তাই অনেকেই বলে গাজওয়াতুল হিন্দ হয়ে গেছে। অনেকে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু (ভারত) বিজয়ের অভিযানকেও গাজওয়াতুল হিন্দ বলে থাকেন। আবার কেউ সুলতান মাহমুদ গজনভীর ভারত অভিযানকেও গাজওয়া বলতে ছাড়েনা। এ ক্ষেত্রে তারা চরম ভ্রান্তির শিকার। হ্যা, হিন্দুস্তানের সকল যুদ্ধই সাধারণভাবে গাজওয়াতুল হিন্দ (হিন্দের যুদ্ধ)। বরং গাজওয়াতুল হিন্দ না, জিহাদে হিন্দ হবে বা হিন্দের জিহাদ হবে। কিন্তু আমাদের আলোচিত গাজওয়াতুল হিন্দ খা'স ও পারিভাষিকভাবেই এটি আলাদা ও স্বতন্ত্র। এবং এটি অদ্যাবধি সংগঠিত হয়নি ।

প্রথমতঃ সমস্ত ভারতীয় উপমহাদেশ নিয়ে কখনোই একযুগে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ হয়নি। এবং ভারতে কখনোই নিরঙ্কুশভাবে ইসলাম বিজয়ী হয়নি ও হিন্দুত্ববাদও মিটে যায়নি।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে সমস্ত দুনিয়ার প্রতিটি কাঁচা-পাকা ঘরে ইসলাম পৌঁছাবে। এবং ইমাম মাহদী ও ঈসা ('আলাইহিমুস সালাম) সমগ্র দুনিয়া বিজয় করবেন। সে হিসেবে ভারতীয় উপনহাদেশের প্রতিটি ঘরে তাওহীদের কালেমা পৌঁছাবে। হিন্দুরা পরাজিত হবে। কিন্তু ভারতে এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ হল হিন্দুরা। কিন্তু ক্রমবর্ধমান সনাতনী হিন্দুত্ববাদের প্রতিষ্ঠা, বর্ধিষ্ণু গোঁড়ামিপূর্ণ পৌত্তলিকতা, ইসলাম বিদ্বেষ, মুসলিমদের উৎখাত, ভারত শুধুই হিন্দুত্ববাদের ভূমি- এসব চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠা এবং হাজার বছরের দ্বেষ, ক্রোধ, প্রতিশোধপরায়ণতা ক্রমেই হিন্দুত্ববাদীদের ইসলামের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। এবং একটি সমূহ যুদ্ধের সূত্রপাত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ভারত থেকে মুসলিম বিতাড়ণের যে পাঁয়তারা তারা করছে তা নিশ্চিত দাঙ্গা ও যুদ্ধের দিকে যাচ্ছে এবং এসব হিন্দুদের ফায়সালার জন্যেও একটি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে আছে। তাই হিন্দু-মুসলিমের এই পরস্পরবিরোধী স্রোতের সমাধানের জন্যে একটি যুদ্ধ হবে এবং তাই হবে ইনশা আল্লাহ **"গাজওয়াতুল হিন্দ"**।

তৃতীয়তঃ হাদীসে দুইটি দলের জন্যে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের সুসংবাদ এসেছেন। ১) শামের মুজাহিদীন ২) হিন্দুস্তান অভিযানকারী।

"আমার উম্মতের দুটি দল এমন আছে, আল্লাহ যাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ করে দিয়েছেন। একটি হল তারা, যারা হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আরেক দল তারা যারা (শামে) ঈসা ইবনে মারিয়ামের সঙ্গী হবে'। (সুনানে নাসায়ী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪২)

এখানে একই হাদীসে শামের সাথে হিন্দুস্তানের যুদ্ধাদের আলোচনা থাকার কারণেও উভয় যুদ্ধটি সমসাময়িক হওয়ার সম্ভাব্যতা থাকে।

চতুর্থতঃ আমাদের এই দলীলটি এতই স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত যে এরপরে আর কোনকিছুই লাগেনা। হাদীসে এসেছে যে- **"গাজওয়াতুল হিন্দের যুদ্ধারা যুদ্ধ বিজয় করে হিন্দু রাজাদের বন্দী করে শামে (সিরিয়ায়) যাবে, এবং সেখানে পৌঁছে ঈসা (আঃ) কে পেয়ে যাবেন!"**

সুবহানাল্লাহ্! তাহলে গাজওয়াতুল হিন্দ হবে ঈসা (আঃ) এর সমসাময়িক সময়ে। ঈমাম মাহদী আসার কয়েক বছর পরে ঈসা (আঃ) দুনিয়াতে পুনরায় আসবেন। সুতরাং গাজওয়াতুল হিন্দের সময় শামে ইমাম মাহদীও থাকবেন। বিইজনিল্লাহ্। আল্লাহু আকবার! আর ঈমাম মাহদী হবেন সম্মিলিত নেতা এবং মুসলিম উম্মাহ তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকবে, তাই তিনি ঐ সময়ের সব ফ্রন্টেরই নেতৃত্ব দিবেন। ব্যতিক্রম হবে না হিন্দের ক্ষেত্রেও! আল্লাহর জন্যে কোন কিছুই অসম্ভব নয়! তখন শামে দামেশকের কেন্দ্রীয় মসজিদের সাদা মিনারে দুইজন ফিরিশতার কাঁধে ভর করে ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন। অতঃপর যুদ্ধরত থাকবেন! দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

হযরত নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রা.) বলেন, ঈসা (আঃ) দামেশকের পূর্বদিকে সাদা মিনারের নিকট অবতরণ করবেন। তিনি হালকা হলুদ রঙের জোড়া পরিহিত অবস্থায় দু'জন ফেরেশতার কাঁধে ভর করে নামবেন। যখন তিনি মাথা নীচু করবেন, তখন মাথা থেকে পানির ফোঁটা টপকে পড়বে এবং মাথা উঁচু করলেও পানির ফোঁটা পড়বে। যে পানির ফোঁটা মুক্তার ন্যায় রৌপ্যের টুকরার মতো স্বচ্ছ হবে। তাঁর নিঃশ্বাসের বাতাস যে কাফিরকে ছুঁবে, সে-ই মারা যাবে। তাঁর নিঃশ্বাসের বাতাস তাঁর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে। তিনি দাজ্জালকে বাবে লুদ্দ-এর নিকটে পাবেন এবং সেখানেই তাকে হত্যা করবেন। (মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা/ সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খণ্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা/ জামি' তিরমিযী, ৯ম খণ্ড, ৯২ পৃষ্ঠা/ সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খণ্ড, হাদিস নং ১৩৫৬/ মুসনাদে আহমাদ, ৪র্থ খণ্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা)

চিত্রঃ ইসা (আঃ) এর মাসজিদ

শাহ নিয়ামতুল্লাহ (রহিঃ) ৮০০ বছর আগে তার ক্বাসীদায়ও হিন্দকে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এনেছেন। সেই হিসেবেও গাজওয়াতুল হিন্দ সংগঠিত হয়নি। এবং মুসলিমদের একটি ভূখন্ডের নেতা মোনাফিক্ব হবে বলেছেন। এবং সেই নেতার নামের প্রথম অক্ষর হবে **'শ'** (শীন) এবং শেষ অক্ষর হবে 'ন' (নুন)। সেই মোনাফিক্ব নেতা ভারতের সাথে একটি চুক্তি করবে। তিনি এটিকে **পাপচুক্তি** বলেছেন। আমরা এই বইয়ের শেষদিকে ক্বাসিদাটি যুক্ত করেছি। অতএব "**গাজওয়াতুল হিন্দ**" হয়নি। শীঘ্রই হবে ইনশাআল্লাহ্।

বিস্তৃতি ও সার্বজনীনতা

হিন্দুস্তানের এই যুদ্ধটি হবে একটি সর্বদলীয়, সর্বগ্রাসী দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। এই **যুদ্ধ কিছুতেই মুষ্টিমেয় মুজাহিদীন এবং হিন্দুত্ববাদী ভারতের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবেনা**। বরং এতে অংশ নিবে ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, মায়ানমার, শ্রীলংকা। বিদেশি শক্তি হিসেবে চীন, রাশিয়া, আমেরিকা। এবং এটি ভারতীয় উপমহাদেশের কোন একটি অলি-গলিকেও নিস্তার দিবেনা। কোন নবজাতকই তার বিভীষিকা থেকে রেহাই পাবেনা। হাজার বছর ধরে ধূমায়িত যুদ্ধাগ্নি একটুখানি খোঁচাতেই বিস্ফোরিত হয়ে লেলিহান ছড়াবে। আফগানিস্তান থেকে বঙ্গ, যেখানেই এর সূচনা হোক না কেন ক্ষণ মুহূর্তেই তা পুরো উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়বে।

এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের আমরা সাধারণভাবে তিনটি শ্রেণীতে দেখতে পাব।

এক, গণতান্ত্রিক আদর্শ, আধিপত্য, সার্বভৌমত্ব, জাতিয়তাবাদ ও ত্বগুতের সন্তুষ্টির জন্যে লড়াইকারী **পাকিস্তান**। বাংলাদেশও এ ক্ষেত্রে অভিন্ন। এরও আলাদা কোন আদর্শিক চেতনা নেই।

দুই, হিন্দুত্ববাদের জন্যে লড়াইকারী **ভারত**। উপমহাদেশীয় সকল ফাসাদের মূলে যারা, যারা ইসলাম ও মুসলিমদের জন্যে ভারতের ভূমিকে নরক বানিয়ে রেখেছে। এবং এরা যতটা না ভূমিভিত্তিক তার চেয়ে বেশি আদর্শভিত্তিক যুদ্ধ করবে। এদের আদর্শ হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামকে ভারত থেকে বিদায় করে দেওয়া।

তিন, ইসলাম ও মুসলিমদের হেফাজত এবং বিজয়ের জন্যে জিহাদকারী **মুজাহিদীন**। যারা আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে সবরকম পার্থিব স্বার্থের ঊর্ধে থেকে লড়াই করবে। উম্মাহর আশা ও আকাঙ্ক্ষা তাদের ঘিরেই। এবং এই আলোচনায় আমরা তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করছি।

এবং বাকি যারা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তারাও এই **তিন** শ্রেণীর ছায়াতলেই অংশগ্রহণ করবে। হোক আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, মায়ানমার বা দুনিয়ার দূর প্রান্তের হিজরতকারী মুজাহিদীন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মিত্রদের সাথে সমবেত হবে। যদিও যুদ্ধটির নামকরণ রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছেন। যদিও যুদ্ধটি হবে মালাউন হিন্দুদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ। যদিও মুজাহিদীনরাই হবে এই যুদ্ধের বরপুত্র ও বিজয়ী। তথাপিও এটি একটি সর্বদলীয় যুদ্ধ হবে। জাত-পাত নির্বিশেষে সবাই এতে অংশ নিবে। সামরিক-বেসামরিক কেউই বাদ যাবেনা। মোদ্দা কথা দুনিয়ার সৃষ্টি তথা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পর থেকে আজ অবধি এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত এমন যুদ্ধ ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করেনি। আর কখনো করবেনা। নানা কারণেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে বহুমুখী শক্তির উথান, আধিপত্য, জ্যেত্যাভিমান, আন্তঃধর্মীয় সংঘর্ষ এক ভয়াবহ যুদ্ধের দিকে ধাবিত করছে ভারতের ভবিষ্যতকে।

তাই গাজওয়াতুল হিন্দ শুধু একদিনের এক আকস্মিক যুদ্ধ নয় যে কেউ চাইলেই মুখ ফিরিয়ে নিবে বা অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে ঘরে বসে থাকবে। বরং এই যুদ্ধ সকল ধর্মের, সকল মতের, সকল পথের, সকল বয়সের প্রতিজনের কাছে উপস্থিত হবে এবং যুদ্ধের উত্তপ্ততা পরখ করাবে।

যুদ্ধের সম্ভাব্য কারণসমূহ

উপর্যুপরি বৃটিশদের হিন্দুস্তান শাসন, ভারতকে মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিভক্তি, হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য সৃষ্টি, অখন্ড হিন্দুস্তানকে খন্ড-বিখন্ড করণ, বৃটিশদের থেকে হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা উদ্ধার... হিন্দু-মুসলিম আলাদা রাষ্ট্রের চেতনায় ভারত-পাকিস্তান নামের আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হওয়া, দেশ ভাগের নামে চালানো গণহত্যা পাশবিকতা...
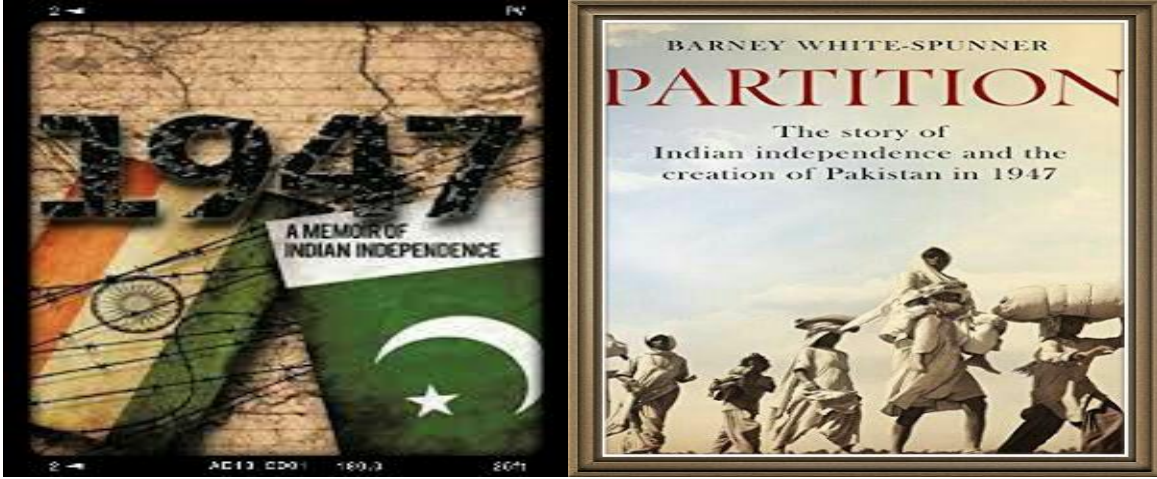
চিত্রঃ ১৯৪৭ সালের দেশভাগ , বাস্তুভিটা ছেড়ে অচেনা গন্তব্যে মুসলিমরা

ধর্মীয় দাঙ্গা, নতুন করে ভারতের হিন্দুত্ত্ববাদ রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভাব, ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষ ও যুদ্ধংদেহী মনোভাব, অনেকগুলি দাঙ্গা ও হাজারে হাজারে মুসলিম হত্যা, বাবরি মাসজিদের মতো শত মসজিদকে শহীদ ও বিলীন করে দেওয়া ধর্মীয় দাঙ্গা, নতুন করে ভারতের হিন্দুত্ত্ববাদী রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভাব, ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষ ও যুদ্ধংদেহী মনোভাব, অনেকগুলি দাঙ্গা ও হাজারে হাজারে মুসলিম হত্যা, বাবরি মাসজিদের মতো শত মসজিদকে শহীদ ও বিলীন করে দেওয়া...

চিত্রঃ ঐতিহাসিক বাবরি মাসজিদ শহীদ করছে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা

১৯৭১ এ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম, ত্রিমুখী নীতির মেরুকরণ, ৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে ভারতের সহায়তা, পাকিস্তানের পরাজয় ও প্রতিশোধপরায়ণতা, ভারত-পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রধর রাষ্ট্র হওয়া, বিশ্ব ক্ষমতা দ্বিমেরুকরণ হওয়া এবং চীন-রাশিয়া ও আমেরিকা-ন্যাটো বেল্টে ভারত-পাকিস্তানের আলাদা অন্তর্ভুক্ত হওয়া...

উপমহাদেশের সার্বিক আধিপত্য, কাশ্মির স্বাধীনতা ইস্যুতে ভারত-পাকিস্তানের বিপরীত অবস্থা ও একটি দীর্ঘ যুদ্ধের মাঝ দিয়ে যাওয়া ভারত-পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও আত্মমর্যাদার ক্রীড়নক হিসেবে কাশ্মিরকে ব্যবহার...

চিত্রঃ আর,এস,এস এবং বজরঙ্গী হিন্দু, বলার অপেক্ষা রাখেনা কাদের বিরুদ্ধে এই রণ হুঙ্কার!

চিত্রঃ জালেম পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১

কাশ্মির ইস্যু উত্তপ্ত হওয়া, কাশ্মির স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হওয়া, কাশ্মির নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের ইঁদুর-বেড়াল নীতি, বিশ্ব মুসলিমদের কাশ্মিরের প্রতি সংহতি, মুজাহিদীনদের কাশ্মির জিহাদের আগ্রহ, নীতিগতভাবে কাশ্মির ইস্যুতে আস্থা হারানো,

চিত্রঃ কাশ্মির সীমান্ত ও (অনলাইন) মানচিত্র

পাকিস্তান-জাতিসংঘের কৌশলপূর্ণ চালাকি প্রচেষ্টা,

সশস্ত্র লড়াই-ই কাশ্মির সমস্যার একমাত্র সমাধান অনুধাবিত হওয়া,

বাংলাদেশের ভারতের প্রতি একমুখী সমর্থন, গোলামি নীতি, বাংলাদেশকে ভারতের দাস রাষ্ট্রে পরিণত করা, একটি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে সর্বাংশে হিন্দুত্বকরণ, সার্বভৌমত্বের খেলাফ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি যা ভারতের সামরিক বাহিনীকে বাংলাদেশে যে কোন অভিযান পরিচালনার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে, একনিষ্ঠ আলিম ও তাওহিদী জনতাকে নিগৃহীত করা, আরাকানে বৌদ্ধদের দ্বারা মুসলিমদের জাতিগত ধর্ষণ-উচ্ছেদ ও গণহত্যা, ভারতের প্রকাশ্য

চিত্রঃ বাংলা-ভারত সেনাবাহিনীর মধ্যে সামরিক চুক্তি

সমর্থন, ভারত-মায়ানমার মিলে যৌথ সামরিক মহড়া, আসামের মুসলিমদের গ্রেপ্তার, নাগরিকত্ব বাতিল, ঘর-বাড়ি ধ্বংস করা, ভারতের সাতটি অঙ্গের (Seven Sisters) স্বাধীনতার দাবী ও সংগ্রাম, পানি নিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশ পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব, ভারত-পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের

চিত্রঃ শাপলা চত্বরে সমবেত ঈমানের দাবীতে লাখো মানুষের ঢল

চিত্রঃ ৫ই মে, ত্বগুত সরকার কর্তৃক আহত-নিহত মাজলুম মুসলি

চিত্রঃ আসামে মুসলিম নিগ্রহের প্রাক্কালে ভারতে ইজরাঈল প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু, (এর কয়েকদিন পরই আসামে মুসলিমদের নাগরিকত্ব বাতিল ও উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়)

দুটি ভয়ঙ্কর নিকৃষ্ট-ভোগবাদী গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং 'আইএসআই' এর নিরবচ্ছিন্ন কুট-কৌশল ও চক্রান্ত, বিদেশি পরাশক্তির এজেন্ট হওয়া, ভারত রাষ্ট্রে চরম মুসলিম বিদ্বেষী ও হিন্দু জঙ্গীসংগঠনের ক্ষমতাসীন হওয়া, আরএসএস, শিবসেনা, বজরংদের মুসলিম নিধন মানসিকতা ও একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ, ভারতের সাথে ইজরাইলের বন্ধুত্ব ও একাত্মতা, ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত উত্তেজনা ও বার কয়েকের চাপা যুদ্ধ, মায়ানমারের বৌদ্ধ ও ভারতের হিন্দুদের জোটবদ্ধ হওয়া এবং ***মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিজেদের আগ্রাসনসহ জানা-অজানা অসংখ্য কারণ যুগের পর যুগ ধরে গাজওয়াতুল হিন্দ অনাবশ্যকীয় করে তুলেছে। এগুলো তারই কিছু নমুনা মাত্র। জুলুম, অত্যাচার, নির্মমতা, গাদ্দারী আর ইসলাম বিদ্বেষের ফিরিস্তি বিশাল। কিন্তু আমরা কজনই বা খবর রাখি!***

এর বাইরে শাহ নি'আমতুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ'র গাজওয়াতুল হিন্দ নিয়ে ৮০০ বছর আগে করে যাওয়া ভবিষ্যদ্বাণী, ইসলামের পুনরায় বিজয়ী হওয়ার যে জাগরণ প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য, সিন্দু থেকে ইউফ্রেটিস নদীর তীর, আর বঙ্গপোসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর, ইন্দোনেশিয়া থেকে স্পেন তথা পৃথিবীর সর্বত্রই শুরু হয়েছে তারই ঢেউও আছড়ে পড়েছে উপমহাদেশেও। তাওহীদ ও জিহাদের এক নব জাগরন শুরু হয়েছে-

বাশেঁরকেল্লা-বালাকোট, ফকির বিদ্রোহ, লাল মাসজিদ, জামেয়া হাফসা, হেফাজতের ৫ ই মে আজ একত্রিত হয়ে নব বিপ্লবে জয়ের বার্তা নিয়ে ফিরে এসেছে, হিন্দের সমুদ্রে জিঞ্জির ছেঁড়া উচ্ছ্বাসের গর্জন উঠেছে।

উপমহাদেশের বিদগ্ধ গবেষক, আলেম, মুজাহীদ আসেম ওমরের ভাষায়-

“আফগানিস্তান থেকে তাকবীরের প্রতিধ্বনি শুনুন। আপনাদের ভাইয়েরা মরনাস্ত্র দিয়ে সজ্জিত হয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছেন রণক্ষেত্রে। তারা এ জীবন বিক্রি করছেন জান্নাতের জন্য। তাদের অন্তর্ভুক্ত শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধ, এমনকি মা ও বোনেরা। তারা সবাই আপনাদের অপেক্ষায়। তারা সবাই ভারতীয় মুসলিমদের সাথে আছেন। আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর রবের শপথ নিয়ে বলছি, আপনারা যদি একবার জিহাদের জন্য দাঁড়িয়ে যান, ফিলিপাইন থেকে মরক্কো'র মুজাহিদীন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আপনাদের সাথে দাঁড়াবেন। মক্কা, মদিনা, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর, লিবিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো এবং বিশ্বের প্রতিটি কোণের মুজাহিদীনরা আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন যেভাবে তারা এই অঞ্চলের মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন অতীত ইতিহাসের ন্যায়। আফগান ভূখণ্ড আপনাদের সাহায্যের ডাকের অপেক্ষায়। আপনারা দেখবেন যেখানে আপনাদের অশ্রু পড়ে সেখানে মুজাহিদীনরা তাদের রক্ত উৎসর্গ করবেন। যে হাত আপনাদের ক্ষতি করতে চাইবে তা একেবারে কেটে ফেলা হবে। আমি হুনাইনের রবের শপথ নিয়ে বলছি, যারা আপনাদের সন্তান ও নারীদের জীবন্ত দগ্ধ করেছিলো মুজাহিদীনরা তাদের আবাসকে পানিপথের রণক্ষেত্রে পরিণত করবেন। শুধুমাত্র একটি বার আপনাদের ভাইদের আহ্বান জানান!”’’ [ভারতীয় উপমহাদেশের সমুদ্রে ঝড় নেই কেন' লেকচারের অংশবিশেষ]

কাশ্মির থেকে আরাকান আজ জিহাদের জন্যে উর্বর ভূমি হিসেবে আবাদ হয়েছে। মুহাম্মাদ বিন কাসিমের উত্তরসূরিরা আজ হিন্দুস্তানের প্রতিটি ঘরে তাওহীদের কালেমা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পর তৃতীয় শক্তি হিসেবে আজ আবির্ভূত হয়েছে উম্মতের মুজাহিদরা।

সবাই তটস্থ। কি চায় তারা! ইসলামের বিজয়, কালিমার বুলন্দি আর মুসলিমদের মুক্তি। আল্লাহর ভূমিতে আল্লাহর আইনের শাসনই কেবল সক্ষম এতে! সুতরাং ভারত-পাকিস্তানের শত্রুতার সাথে আরেকটি নতুন খেলোয়ার মাঠে এসেছে, যারা এতটাই তীব্র, বাঁধভাঙা আর বে-পরোয়া যে সারা বিশ্ব পেরেশান, হয়রান।

নিন্দুকেরা তাদের উগ্র আর জঙ্গী যে উপাধি-ই দিক না কেন, যত প্রোপাগান্ডাই করা হোক কেন তারা আজ সবকিছুকে অগ্রাহ্য করার দীপ্ত শপথ নিয়েছে। অতএব যারা জিহাদ পরিত্যাগ করেছে আল্লাহ তাঁদের পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আল্লাহ আজ গুরাবাদের পুরো জাতি থেকে নির্বাচিত করেছেন! তাদের শানে দয়াময় আল্লাহ ইরশাদ করেন

"হে ঈমানদারগণ তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে। তারা মু'মিনদের প্রতি নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের

নিন্দার পরোয়া করবেনা। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী মহাজ্ঞানী! [সুরা মায়েদা; ৫৩]

কবি কত সুন্দর বলেছেন,

"আজ পৃথিবীর দিকে দিকে শুনি জিহাদের ডাক, কেউ জাগে নও জুশ লয়ে কেউ ভয়ে নির্বাক, কেউ বলে তাকে মুক্তির পথ কেউ বলে সন্ত্রাস, কেউ ভাবে তাকে কল্যাণকর কেউ বা সর্বনাশ, পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের সব সরকার পেরেশান, প্রচার মিডিয়া কিছু না বুঝিয়া হয়রান হয়রান, জিহাদের হয় অপব্যবহার জানিনা সে দোষ কার, আসলে জিহাদ কুর'আনে লিখা ফরমান আল্লাহর, জিহাদ শক্তি, জিহাদ মুক্তি, জিহাদ মিথ্যে নয়, শোষিত পীড়িত মাযলুমানের জিহাদেই আশ্রয়"

তারা আল্লাহ এবং মু'মিন ব্যতীত সবার সাথেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারা নতুন যুদ্ধা, যুদ্ধের সব পক্ষই তাদের প্রতিপক্ষ, না ভারত, না রাশিয়া-আমেরিকা আর না ইসলামের নাম ব্যহারকারী মিল্লাতের অবাধ্য সন্তান পাকিস্তান! সবাই শত্রু। ***তারাই কেবল বন্ধু যারা আল্লাহর শরীয়তের জন্যে লড়াই করে। সুবহানাল্লাহ্!***

সুতরাং এইসব কিছু আল্লাহর রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী'কৃত যুদ্ধকে বাধ্যতামূলক ও অবশ্যম্ভাবী করেছে এবং আমাদের প্রজন্ম তা সংগঠিত হবার সব ধাপ পূরণ করেছে। হিন্দ এখন এক অভূতপূর্ব ভয়ঙ্কর যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত!

কেউ কি আছে..কাফেলাবদ্ধ হবে!

গাজওয়াতুল হিন্দ এখন আরো স্পষ্ট হয়ে গেছে

একটা বিষয় সতত স্বচ্ছ হয়ে গেছে যে উপমহাদেশের হিন্দুরা একটি অখন্ড হিন্দু রাজ্য গঠন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ অখন্ড হিন্দুরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে বাংলাদেশও। এর জন্য তারা সর্বাত্মক প্রস্তুতিও গ্রহণ করছে। এবং এ প্রস্তুতি যে একটি যুদ্ধ ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে মুসলিমদের বিলুপ্তি ও হিন্দুত্ববাদের রাম রাজ্য গঠনের জন্য তাও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। উপমহাদেশের সকল সচেতন হিন্দুরা ভারত রাষ্ট্রের সরকারি তত্ত্বাবধানে সার্বিকভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি, প্রচারণায় অংশগ্রহণ করছে।

আজ থেকে প্রায় দেড় সহস্র বছর আগে আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ রাসুল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার উম্মতের শেষদিকে হিন্দুস্তানে সনাতনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধ "গাজওয়াতুল হিন্দ" এর কথা বলে গিয়েছেন। সুসংবাদ দিয়েছেন সামগ্রিক বিজয়ের। হিন্দুত্ববাদের বিনাশের। ইসলামের প্রতিষ্ঠার। পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে শিরকের আঁধার ঘুছে তাওহীদের আলোকোজ্জ্বল এক অধ্যায়ের। মূর্তি ও প্রতিমার বদৌলতে এক আল্লাহর ইবাদাতের। কাশি ও বৃন্দাবনের নাম নিশানা মুছে আল্লাহর ঘর কা'বামুখী জনতার ঢলের। গঙ্গার জলের পবিত্রতার নামে অশ্লীলতার গল্প ছাপিয়ে জমজমের সতেজ সজীব অপার্থিব পবিত্রতার জলধারায় শুদ্ধি হাসিলের এক শুদ্ধ গল্পের।

সুসংবাদ দিয়েছেন এ যুদ্ধের গাজীদের, বিজয়ীদের। মুক্তির, নাজাতের, জান্নাতের। শহীদদের বলছেন সর্বোত্তম শহীদ।

হাদীসের সুসংবাদের জন্যই আমরা বিশ্বাস করি হিন্দুস্তান আমাদের হবে। ইসলামের বিজয় হবে। সকল মালাউন হিন্দুদের আস্ফালন নিঃশেষ হবে চিরতরে। হাদীসে এই যুদ্ধের ফযীলতের জন্যই আমরা প্রস্তুতি নিতে পারি। হুংকার দিতে পারি। স্বপ্ন দেখতে পারি অখন্ড ইসলামি ভূখন্ডের। মাগরিব থেকে মাশরিক - আবিশ্বজুড়ে সকল মু’মিন মুসলিমই এমন স্বপ্ন দেখে। দেখতে পারে। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের তামান্না রাখে। রাখতে পারে। হাদীসের এমন সুসংবাদই আমাদেরকে উদ্দীপ্ত করে। এর বাইরে গিয়ে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর আইন, ফিতনা নির্মূলের আগ পর্যন্ত কিতাল, নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্যের জন্যেও আমরা যুদ্ধ করতে পারি। আমাদের আবেগ আর খায়েশের বশে না। বরং আল্লাহর কিতাব আর শরীয়তের হুকুম পালনের জন্যই। সুতরাং গাজওয়াতুল হিন্দ তো আমাদের ধর্মীয় বিষয়। ঈমানের অংশ। মজলুম উম্মাহকে সাহায্য করা তো আমাদের রবের হুকুম। ইসলাম প্রতিষ্ঠা তো আমাদের জন্য ফারদুল আইন। চাইলেও আমরা এমন মহান ব্রত থেকে বিরত থাকতে পারিনা।

এতো গেল এক পক্ষের বিষয়। কেবল ঈমানদীপ্ত মুসলিমদের কথা। উম্মাতের অতন্দ্র প্রহরীদের কথা। কিন্তু কিছু সুশীল অতিমাত্রায় উদারপন্থী মডারেট মুসলিমরা কি শরীয়ত আর হাদীসের প্রতি এত বিশ্বাস রাখতে পারে! বাতিলের অস্ত্রের প্রদর্শণীর সামনে বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে পারে? মুশরিক মালাউন প্রভুদের চোখে চোখ রেখে বলতে পারে সারা জাঁহা হামারা, হিন্দুস্তান ভি হামারা? তারা কি পারে ডলার ও রুপীর ফোঁয়ারার সামনে নির্মোহ থাকতে। তাদের কি পাশ্চত্যের ধবল ধোলাই মস্তিষ্কের বাইরে একটি চিন্তাশক্তি সম্পন্ন মস্তিষ্ক আছে?

তাই তারা মুসলিমদের যুদ্ধ জিহাদে বিশ্বাস করতে ভয় পায়। হিন্দুদের বিরুদ্ধে কথা বলতে আত্মা দেহ থেকে যায় যায় ভাব। তারা শুধু ভবিষ্যত সংক্রান্ত হাজার বছর আগেকার এক ব্যক্তির হাদীসের ওপর ভরসা করতে আশ্বস্থ হয়না। তার ওপরে তারা দেখে অল্প কিছু বিচ্ছিন্ন মুসলিম এমন অসম আর অলীক যুদ্ধের কথা বলে। অপরদিকে সারা দুনিয়া তাদের বিপক্ষে। তাই তারা এসকল গুরাবাদের দিকে ইশারা করে বলে কিছু মুসলিমরা উগ্রবাদী। সাম্প্রদায়িক। ভিন্ন জাতির প্রতি বিদ্বেষী। শান্তি বিনষ্টকারী। হিন্দু-মুসলিম সম্পৃতির পথে অন্তরায়। এ জন্যেই আগে বেড়ে তারা সকল সমাধানকে পাশ কাটিয়ে শুধু যুদ্ধ জিহাদ নিয়ে পড়ে থাকে। লড়াই আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী। সন্ত্রাসী।

এসব নামধারী মুসলিমদের ওয়াশ হওয়া ব্রেইন আর কুফরী মিশ্রিত পৌত্তলিক চিন্তার বিষয়টি সুরাহা কিভাবে করবেন? কিভাবে তাদের চিন্তার বাতুলতা বুঝিয়ে দেবেন? গাজওয়াতুল হিন্দের সত্যিকারের বাস্তবতা এবং মালাউন হিন্দুদের আসল চেহারা যাবত না বুঝবে ততক্ষণ তারা ঈমানদার মুসলিমদের আশঙ্কার বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেনা। তাই আজ আমরা তাদের চোখে ও বিবেকে ঘাঁ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার সময়ে উপস্থিত হয়েছি। এখন সবকিছু উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। কে আছ হও আগুয়ান, শুনরে পাতিয়া কান।

হঠাৎ করেই অদ্য কিছু বিষয় যেন খুব দ্রুত ঘটতে শুরু করেছে। যে বিষয়গুলো ছিল সুপ্ত, অপ্রকাশিত, যার আশঙ্কায় উম্মতের গুরাবারা কত কত কাল ধরে উম্মতকে সতর্ক করে আসছিল- তারপর হঠাৎ কেমন যেন সেই বিষয়গুলো উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এখন আর কোন রাখঢাক থাকছেনা। শত্রু যেন তার মুখোশ খুলে ফেলেছে। আর গুরাবাদের আশঙ্কাকে বাস্তবে পরিণত করে উপমহাদেশ যেন ক্রমেই হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসনের গ্রাসে পরিণত হতে যাচ্ছে। আশঙ্কার দিনগুলি খুব দ্রুত চোখের সামনে চলে এসেছে। যা ছিল কিতাবে, লেখায়, আলোচনায় বক্তব্যে আশঙ্কায় - তা আজ যেন সুস্পষ্ট বাস্তবে চলে এসেছে!

পুরো ভারতে আজ মুসলিমবিরোধী যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিয়েছে। জয় শ্রীরামের নারা লাগিয়ে সকল সনাতনি আবাল বৃদ্ধ বণিতার একটাই শ্লোগান - "জো না বোলে জয় শ্রী রাম, ভ্যেজ দ্যু ইসকো কবরস্থান"

আজ উপমহাদেশের যুদ্ধের দাবিতে এক পক্ষের হাঁকডাকের দিন পেরিয়ে নতুন দিন এসেছে। প্রেক্ষাপটে প্রতিপক্ষ হিন্দুরা দিব্যিই চলে এসেছে। রীতিমত আয়োজন উৎসব করে। গুজরাট দাঙ্গার কসাই মোদী আজ সমগ্র হিন্দুদের নেতৃত্ব নিয়েছে। গরুর গোশত খাওয়ার অপরাধে মুসলিম হত্যাকারী, শ্রী রাম বলতে না চাওয়ায় মুসলিম ছাত্রী ধর্ষণকারী উগ্র হিন্দুদের সংগঠন বজরং শিবসেনা আজ ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। ইহুদীদের অন্যতম মিত্র ইসকন আজ দায়িত্ব নিয়েছে বাংলাদেশ সামলানোর। যারা বাংলাদেশ প্রশাসনকে হিন্দুত্বকরণের কাজটি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছে।

আজ ভারতে ভগবত সৈনিকদের মাহফিল হচ্ছে। হাজার হাজার নারী পুরুষরা "মুসলিম রুকখো, ইসলাম রুকখো" শ্লোগান দিচ্ছে। বক্তারা অখন্ড হিন্দু রাজ্যের বাণী শুনাচ্ছে। জয় শ্রী রামের মুহুর্মুহু শ্লোগানে প্রকম্পিত হিন্দুস্তানের আকাশ বাতাস। স্কুল কলেজ, মন্দির আশ্রম, মাঠ আর হাটে লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে বেজে উঠছে ধারালো তলোয়ারের ঝংকার। ব্রাহ্মণরা হুংকার দিয়ে বলছে "অখন্ড হিন্দু রাজ্য সেরেফ বাতু সে নেহী হ্যায়, বলকে বিস ম্যায় আয়েগা" - অখন্ড হিন্দু রাজ্য কেবল কথার কথা না, বরং ‘২০ সালেই আসতেছে। এভাবেই পুরো ভারত উত্তাল হয়ে উঠছে অখন্ড হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে। এ সংক্রান্ত ভিডিওগুলি ভাইরাল হয়েছে। যা আমাদের সংগ্রহে রয়েছে।

প্রতিটি স্কুল কলেজে ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য শারীরিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। লাঠি, তলোয়ার আর রাইফেল চালানো শেখানো হচ্ছে। একটি ভিডিওতে দেখা যায় একজন হিন্দু ধর্মগুরু অখন্ড হিন্দু রাজ্যের জন্য সকল হিন্দুদের ঘরে ঘরে হাতিয়ার রাখার কথা বলছে। সকল হিন্দুরা হাত উঁচিয়ে অস্ত্র প্রদর্শন করছে। আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায় সবাই হাতিয়ার চালনার কসরত করছে। একটি শিশুও ছিল। যাকে জিজ্ঞেস করা হয় কেন অস্ত্র চালনা শিখছে। শিশুটি বলে মুসলিমদের প্রতিহত করতে। জিজ্ঞেস করা হল মুসলিম কারা? সে বলল যারা গরু খায়, সন্ত্রাসীরা। আরেকটি ভিডিওতে এক বিজেপি নেতা দাবি করছে ইসলাম এসেছে দেড় হাজার বছর আগে। আর সনাতনি ধর্ম পৃথিবীর পুরনো এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কয়েক হাজার বছর পূর্বেই ছিল। তাই হিন্দু ধর্ম হল পিতা এবং ইসলাম হল বেটার মত। বেটা কিভাবে পিতার ওপর প্রাধান্য পেতে পারে? কর্তৃত্ব তো বেটার ওপর পিতার থাকবে (!)।

অখন্ড হিন্দু রাজ্যের অংশ বানাতে বাংলাদেশে ইতিমধ্যে তাদের অনুগত সরকারকে ক্ষমতায় স্থায়ী করেছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানকল্পে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে হস্তক্ষেপের অধিকার দিয়ে চুক্তি হয়েছে। ইসকনের স্বামীবাগের মন্দিরের পক্ষ থেকে যে চিঠিটি সাংবাদিক ইলিয়াস হোসাইন তার ১৫ minutes ভিডিওতে প্রকাশ করেছে সেখানে অখন্ড হিন্দু রাজ্য গঠন, বাংলাদেশকে দখল, সর্বক্ষেত্রে ভারতীয় এজেন্ট নিয়োগ, এদেশীয় হিন্দুদের আর্থিক ও আদর্শিক

প্রলোভন দেখিয়ে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠায় এজেন্ট রিক্রুট সহ স্কুলে মুসলিম ছাত্রছাত্রীদেরকে জয় শ্রী রাম বলানো, মাসজিদে আগুন লাগানো, নামাজের সময় গান বাজনা চলাকালীন ইমাম বাধা দিলে ইমামকে হত্যা, প্রিয়া সাহা ট্রাম্পের কাছে মুসলিম মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া এবং ২০২১ সালের মাঝে অখন্ড হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা, হিন্দুত্ববাদের জন্য নিবেদিত শ্যামলি পরিবহণ ও শ্যামলি গ্রুপের মালিকের বাংলাদেশ ভারত এক হওয়ার জন্য কাজ করার ঘোষণা কেবল সে আশঙ্কারই কিছু বাস্তব নমুনা যা উম্মতের সচেতন মুসলিমরা মুশরিক মালাউনদের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করে আসছিল বহুকাল ধরেই।

এরই ধারাবাহিকতায় হিন্দুদের ধর্মীয় পথযাত্রাকালীণ একজন উগ্র হিন্দু যুবকের লাইভ ভিডিও জনসমক্ষে আসে। আমি তার কিছু কথা এখানে উদ্ধৃত করছি। যদিও তা প্রকাশ করার মানসিক অবস্থায় আমি নেই এবং তা বরদাশত করা খুবই ভারী কাজ প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই। একই সাথে ভয় ও আতঙ্কেরও- "আমি কুমার, আজ খুশির দিন, এই অপশক্তি, অপসংস্কৃতি, আরব থেকে চলে আসা এ অসভ্য কুসংস্কার, যে সংস্কৃতি সারা বিশ্বকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। রাশিয়া থেকে ব্রিটেইন, আমেরিকা থেকে জাপান, পৃথিবীর কোন অংশই এই শয়তানরা বাদ রাখছেনা। এই শয়তানদের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন করতে হবে। এরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাদের জাগিয়ে তুলেছে। আমরা কখনো হিন্দুত্ত্ববাদী ছিলাম না। এরাই আমাদের এত বড় হিন্দুত্ববাদী করে তুলেছে। এরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাদের জাগিয়ে তুলেছে। যখন বাঘকে সিংহকে জাগিয়ে তুলেছে তখন তাদেরকে গ্রাস করে ছাড়ব। তাদের আল্লাহ, কেউ, কেউ আমাদের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেনা.....ট্রাম্প যেমন ইরাক, ইরান, আফগানকে শেষ করেছে আমরাও ওদেরকে শেষ করব....." (নাঊযুবিল্লাহ্)

এক কথায় চার মিনিট ষোলো সেকেন্ডের পুরো ভিডিওটি ছিল আবর্শিক চেতনার, আবেগের, রাগের, ক্রোধের, হুংকারের। আল্লাহ, রাসুল, জান্নাত, হুর সবকিছু নিয়েই বিদ্রুপ আর ব্যাঙ্গ করে হুংকার দেওয়া হয়েছে। কোন কিছুর আশা আর সাহায্যই হিন্দুদের হাত থেকে মুসলিমদের বাঁচাতে পারবেনা...(!)

২৩ আগষ্ট, ২০১৯ শুক্রবার জন্মাষ্ঠমীতে সরকার দলের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছে "যারা হিন্দুদের শত্রু তারা জাতির শত্রু"। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যুদ্ধ হলে বাংলাদেশ ভারতের পক্ষে থাকবে বলে ঘোষণা দিয়েছে কত আগেই। কিছু দিন আগে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরে আসলে বাংলাদেশ ভারতের সাথে আছে বলে স্বীয় অবস্থান পুনঃব্যক্ত করেছে। আগরতলা বিমান বন্দরের জন্য ভারতের জায়গা দাবী, খুলনা থেকে সিলেট ভারতের, আসামের ৪০ লক্ষ মুসলিম বাংলাদেশের নাগরিক, তাই তাদের নিতে হবে নতুবা সিলেট তাদের জন্য ভারতকে দিয়ে দিতে হবে দাবীকারী দেশটি কেবল গত মাসে প্রায় ৩ লক্ষ ভারতীয় নাগরিককে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

ভারতের সেলিব্রেটি তারকারা সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করে সামরিক কার্যক্রমের ব্যাপারে হিন্দুদের আগ্রহী করে তুলছে। ইতিমধ্যে স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদায় থাকা মাজলুম কাশ্মিরের জন্য সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫ অনুচ্ছেদ বাতিলের মধ্য দিয়ে কাশ্মিরকে ভারত পূর্ণ দখলে নিয়েছে। রাষ্ট্রটিতে সেনা সংখ্যা বাড়িয়েছে। যার ফলে প্রতি ১০ জন কাশ্মিরির বিপরীতে একজন ভারতীয় সেনা রয়েছে। ব্যাপক ধর-পাকড় এবং গণহত্যার মত ঘটনা ঘটছে। বিদেশি সাংবাদিকরা এসব ঘটনার ব্যাপারে রিপোর্ট করছে এবং পুরো কাশ্মির সব রকম যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে পরিস্থিতি অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছে। আর ঠিক এ সময়ে কাশ্মিরে অবস্থানরত সৈন্যদের একটি ব্যাটেলিয়নে ভারতীয় ক্রিকেট তারকা 'ধোনি' প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও উৎসাহিতকরণের জন্য যোগ দিয়ে পুরো বিশ্বমানবতাকে লজ্জিত করেছে।

এ সকল বিষয় এখন স্পষ্ট এবং যুদ্ধের অপর পক্ষ হিসাবে হিন্দুদের এমন উত্থান যা থেকে উদাস থাকার কোন সুযোগ নেই। গাজওয়াতুল হিন্দের খেলোয়ারেরা মাঠে নিজ নিজ পক্ষে অবতীর্ণ হওয়ার পরও যারা বুঝে না বুঝার ভান করে, দেখে না দেখার ভান করে, তাদের জন্য দুনিয়া আখিরাতে লাঞ্ছনা। হে মূর্খ শিয়ালের দল, তোমরা যুদ্ধে ইসলামের পক্ষে কাতারবন্দী না হও, তবুও আর মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা করে, মিথ্যা বুলি, ঘুম পাড়ানির মিষ্টি গান দিয়ে তাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখোনা!

কিন্তু আমাদের মূল বিষয় এটা নয়। আমরা প্রশ্ন করতে চাই- হিন্দুরা রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি কোথায় পেল? তাদের এমন একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার মত সাহসের পেছনে কারণ আসলে কি? কিসের লাভে, লোভে তারা এমন মৃত্যুঘেরা বিপদভরা পথ বেছে নিয়েছে? রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি হিন্দুত্ববাদের এই নগ্ন ধামাকার কথা জেনে গিয়েই মুসলিমদের এ যুদ্ধ মোকাবিলায় উৎসাহিত করেছিলেন!

আজকে উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদের উত্থান তো তবে আমাদের ঈমানকেই দৃঢ় করে! আমাদের অবস্থানকেই সঠিক বলে সত্যায়িত করে! সুতরাং গাজওয়াতুল হিন্দ এখন প্রতিপক্ষের দিক থেকেও বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে। গাজওয়াতুল হিন্দ এখন আরও স্পষ্ট হয়ে গেছে।

একজন আলিম, আরিফ, গুরাবা কবির ভাষায়-

"ভেড়ার পাল মিলে আজ সতত হারিয়ে গেছে যেন মুমীন মহৎ,

কষ্টেরা ভীড় করে নোনা জলে, চায়না কেহ ফিরে অভাগা বলে?

টেকনাফ তোতোঁলিয়া রূপসা পাথারিয়া, ঘুরে ঘুরে দেখা হল চোখ মেলিয়া-

ফেলানি, নুসরাত, বেলালের রক্তিম কান্না, বদলা নিতে চাই আজ উসামা মুছান্না।

হায়দারি হাঁক দিয়ে আলোকের ঝংকার,

জেগে উঠো মুমিনেরা দাও আজ হুংকার,

ত্বগুতের পথে পথে দেখ জুলুমের রক্ত, তরবারির খাপ খোল আজ গাজওয়ার ওয়াক্ত।

আরাকান কাশ্মির উইঘুর কাবুল, পৃথিবীর সবখানে মানবতা ব্যাকুল,

এখনো তুমি খোজো খানকার সুখ, দরবারি পীরেরা করবে দূর আত্মার অসুখ(!)

আমি ভেবে হয়রান আমাকে নিয়ে, হিন্দের গাজওয়া হোক শুরু মোর রক্ত দিয়ে,

রক্তের সিঁড়ি ছাড়া দ্বীনের ঝান্ডা হয়নিকো উড্ডীন, ঘুম ভাঙো উঠো জেগে যুগের সালাহুদ্দীন!!

গাজওয়াতুল হিন্দ মহাযুদ্ধেরই অংশ

কিন্তু বন্ধু, তুমি কি জান যুদ্ধটি কিভাবে তোমাকে নাড়া দিবে এবং কি অবস্থায় তোমার সাথে সাক্ষাত করবে? তুমি তো ভেবেই নিয়েছ- "একটা যুদ্ধ হয়তো হবে, কিছুটা ভয়ঙ্কর হতেও পারে, কিন্তু তুমি বা তোমার পরিবার পার পেয়ে যাবে, ফাঁক গলে বেড়িয়ে যাবে (!)।

হয়তো ভাবছো, আরে এটা তো গাজওয়াতুল হিন্দ! এটা মহাযুদ্ধ/বিশ্বযুদ্ধ বা হাদীসের ভাষায় মালহামাতুল কুবরা তো আর নয়......!"

না বন্ধু, তুমি ভুলই ভেবেছ, আর ভুলের মাঝেই থেকে গেলে মাশুল টা যে চড়া হয়ে যাবে!

তুমি কি জান! **'গাজওয়াতুল হিন্দ'** মালহামাতুল কুবরা অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধের অংশই হবে! যখন শামে ইমাম মাহদী মালহামা/বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত থাকবেন তখন তুমি হিন্দুস্তানে গাজওয়াতুল হিন্দে ব্যস্ত থাকবে। উভয়টা মিলেই হবে মালহামতুল কুবরা বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

যুহায়র ইবনু হারব ও আলী ইবনু হুজর (রহঃ) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুল (সাঃ) বলেন, **"অচিরেই ইরাকবাসীরা না খাদ্যশস্য পাবে, না দিরহাম পাবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ)! কার কারণে এ বিপদ আসবে"? তিনি বললেন- অনারবদের কারণে। তারা খাদ্যশস্য ও দিরহাম আসতে দিবে না। কিছু সময় চুপ থেকে তিনি আবার বললেন অচিরেই শামবাসীর নিকট কোন দীনার আসবে না এবং কোন খাদ্যশস্যও আসবে না। আমরা প্রশ্ন করলাম, এ বিপদ কোন দিক থেকে আগমন করবে? তিনি বললেন, রোমের দিক থেকে। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, আমার উম্মাতের শেষভাগে একজন খলীফা (ইমামুল মাহদি) হবে। সে হাত ভরে ভরে অর্থ সম্পদ দান করবে, গণনা করবে না।** (সহীহ মুসলিমঃ অধ্যায় ৫৪/ফিৎনা ও কিয়ামতের আলামত, হাদিস নংঃ ৭০৫১, পাবলিশারঃ ইফাবা। বুখারীঃ অধ্যায় ৮১/ ফিৎনা ও কিয়ামতের আলামত।)

২০০০ সালের অব্যবহিত পরেই ইরাকের ওপর অনারব আমেরিকা আর ন্যাটো জোট দ্বারা অবরোধ আরোপ করা হয়, যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক ভাবে ইরাককে বিশ্ব বাজার থেকে বয়কট করা হয়েছিল এবং প্রায় ১০ লাখ ইরাকি সেই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। সাদ্দাম কে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল এবং সকল সম্পদ ডাকাতি করা হয়েছিল।

এটি ছিল হাদীসের প্রথম অংশের সত্যায়ন, **"অচিরেই ইরাকবাসীরা না খাদ্যশস্য পাবে, না দিরহাম পাবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল (সাঃ)! কার কারণে এ বিপদ আসবে"? তিনি বললেন- অনারবদের কারণে। তারা খাদ্যশস্য ও দিরহাম আসতে দিবে না।"**

চিত্রঃ ইরাক যুদ্ধ ও অবরোধের দুটি রূপক ছবি

রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুপ থাকা ও অতঃপর শাম (সিরিয়া) অবরোধের কথা বলার দ্বারা বোঝা যায় ইরাক অবরোধের কিছু দিন পরই সিরিয়া অবরোধ ও যুদ্ধের শিকার হবে। দেখতে দেখতেই ইরাক যুদ্ধের ১০ বছর অতিবাহিত হল। তেল ও অর্থ ছিনিয়ে নেওয়া হল। আবরোধে অভাব ও দুর্ভিক্ষে ১০ লাখ মানুষ নিহত হল।

কিন্তু সিরিয়া যুদ্ধের কোনই লক্ষণ নেই। ইমাম আনওয়ার আল আওলাকি (রাহিঃ) ইরাক অবরোধের পরপরই বলেছিলেন এখন আমাদের সিরিয়ার দিকে তাকানো উচিত, কেননা হাদিস অনুযায়ী শীঘ্রই সিরিয়া অবরুদ্ধ হবে! সুবহানাল্লাহ্! শাইখ আওলাকি ২০১১ সালে শহীদ হন এবং সিরিয়া অবরোধ দেখার আগেই! ২০১২ সাল। আরব বসন্তের ধোঁয়া ক্রমেই বিস্তৃত হতে থাকে। অতঃপর সিরিয়ায় তা পৌঁছাল এবং সশস্ত্র লড়াইয়ে রূপান্তরিত হল। শুরু হল গৃহযুদ্ধ। কাল্ব বংশের নুসাইরিদের আগ্রাসন, লাখো আহলে সুন্নাহর মৃত্যু, এক কোটি সিরিয়ানদের দেশান্তরি, রাশিয়া, ইরান আর আমেরিকার সিরিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং স্মরণকালের ভয়াবহ অবরোধ আরোপিত হলো সিরিয়াবাসীর ওপর।

২০১৫ সালের এক সমীক্ষায় শামে (সিরিয়ায়) দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৫০০। মানুষ গাছের লতাপাতা, বাড়িঘরের পোষা বিড়াল-কুকুর, নর্দমার পানি আর একে অপরের জিহ্বা চুষেও ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণে ব্যর্থ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। মায়ের কোলের দুধের শিশু খাবারর অভাবে বৃদ্ধে পরিণত হচ্ছে।

অতঃপর আজ ৭ বছর অতিবাহিত হয়েছে সিরিয়া যুদ্ধের। ১০ লাখ নিহত, এর অধিক সংখ্যায় আহত। অবরোধে মৃত্যুর সংখ্যা দৈনিক গড়ে ছিল ৫০০ জন প্রায়! এটি হচ্ছে হাদীসের বাকি অংশের বাস্তবায়ন।

চিত্রঃ আরব বসন্তে উত্তাল সিরিয়া

চিত্রঃ সিরিয়া যুদ্ধ ও অবরোধে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ

হাদীসের অপর অংশও বাস্তবায়িত হল-

তিনি আবার বললেন অচিরেই শামবাসীর নিকট কোন দীনার আসবে না এবং কোন খাদ্যশস্যও আসবে না। আমরা প্রশ্ন করলাম, এ বিপদ কোন দিক থেকে আগমন করবে? তিনি বললেন, রোমের দিক থেকে। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, আমার উম্মাতের শেষভাগে একজন খলীফা (ইমামুল মাহদি) হবে। সে হাত ভরে ভরে অর্থ সম্পদ দান করবে, গণনা করবে না।

এখন শুধু খলীফা ইমাম আল মাহদীর আগমন বাকি আছে!

চিত্রঃ সিরিয়া অবরোধে কঙ্কালসার শিশু , এমন সংখ্যা লাখ লাখ

সিরিয়া যুদ্ধই হবে শেষ যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধের শেষ ভাগে ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে। ইমাম মাহদী দামেস্কের উপকণ্ঠে গুতা শহরে ক্যাম্প করবে। এবং মহাযুদ্ধের সময় এটাই হবে মুসলমানদের হেডকোয়ার্টার।

আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত- **রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যুদ্ধের দিন মুসলিমদের শিবির স্থাপন করা হবে 'গুতা' নামক শহরে, যা সিরিয়ার সর্বোত্তম শহর দামিশকের পাশে অবস্থিত।** (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪২৯৮)

চিত্রঃ গুতায়, আক্রান্ত বাড়ির মেঝেতে কুর'আন এবং জানাজার জন্যে প্রস্তুত শিশুদের লাশ

আজকের এই সময়ে যখন গাজওয়াতুল হিন্দ নিয়ে আলোচনা করছি- দীর্ঘ ৭ বছর পর শামের যুদ্ধ গুতা শহরে প্রবেশ করেছে। আল্লাহর ক্বসম আজ থেকে এক মাস আগেও গুতা আলোচনায় ছিল না। কিন্তু এখন প্রতিদিনকার শিরোনাম হল 'গুতা'। গুতা'য় এক অমানবিক যুদ্ধ শুরু হয়েছে, এবং আকাশ থেকে বোমা নিক্ষেপ, ক্যামিকেল বোমা, রাসায়নিক বোমা বাদ যাচ্ছেনা কিছুই। গত ১৫ দিনে গুতা'য় ১২০০ এর অধিক নিহত হয়েছে। যাদের সবাই নিরীহ বেসামরিক এবং অধিকাংশই নারী-শিশু। গুতার বিভৎসতার যে সকল ছবি অনলাইন ও প্রিন্ট মিডিয়ায় আসছে তা কোন সুস্থ ও

বিবেকবান মানুষই সহ্য করতে পারবেনা! **রাশিয়া স্বীকার করেছে তারা ২ বছরে প্রায় ২০০ এর অধিক নতুন অস্ত্র সিরিয়ানদের ওপর পরীক্ষা করেছে!**

ইমাম মাহদীর ক্যাম্পের শহরে মহাযুদ্ধ আগমন করা কি তবে বিশেষ কিছুর ইঙ্গিত!

মাহদী, অতঃপর দাজ্জালের আগমনের পর ঈসা (আঃ) সিরিয়ার রাজধানী দামেষ্কে অবতরণ করবে! তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং শামের দায়িত্ব নিবেন। ইমাম মাহদীর শামে যুদ্ধ করার সময় ভারতীয় উপমহাদেশের যুদ্ধটিও চলবে। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় হিন্দুস্তানের বিজয়ী বীরেরা মালাউন সন্ত্রাসী নেতাদের বন্দী করে শামে গমন করবে। এবং শামে এসে তারা মারিয়াম তনয় ঈসা (আঃ) কে পেয়ে যাবে। **"হযরত সাওবান (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) কে বলতে শুনেছেন যে রাসুলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ হিন্দুস্তানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, "অবশ্যই আমাদের একটি দল হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ সেই দলের যোদ্ধাদের সফলতা দান করবেন, আর তারা রাজাদের শিকল/বেড়ি দিয়ে টেনে আনবে এবং আল্লাহ্ সেই যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন (এই বরকতময় যুদ্ধের দরুন) এবং সে মুসলিমেরা ফিরে আসবে তারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আলাইহি'ওয়াসাল্লাম) কে শামে (সিরিয়া) পাবে।"**

হিন্দুত্ববাদের ভারত

ভারত মুসলিমদের জন্যে ত্রাসের ভূমিতে পরিণত হয়েছে। মুসলিমদের জাতিগত নির্মূলের সকল ধাপ পূরণ করেছে। এবং ভারত আজ শির্কের কালেমাখচিত পতাকা নিয়ে যুদ্ধের হুংকার ছুঁড়ে বেড়াচ্ছে। এসব নরকের কীটেরা বার মাসে তেরো পূজার মতোই যখন তখন দাঙ্গা বাঁধিয়ে মুসলিম হত্যায় লিপ্ত হয়! গরুর গোশত পাওয়ার অপরাধে জীবন দিতে হয় ভারতীয় মুসলিমদের রাস্তাঘাটে! ধর্ষণ করা হয় উম্মতের মা-বোনদের! তার মাত্রা কেমন! একটা রিপোর্ট দেখলেই বুঝতে পারবেন- **"ভারতের দখলীকৃত কাশ্মিরে ১৯৪৭ সাল থেকে, সন্ত্রাসীগোষ্ঠী হিন্দুদের কর্তৃক ২৫০,০০০ মুসলিমা ধর্ষিতা হয়েছে যাদের মধ্যে কাশ্মিরেরই ২০০,০০০ মুসলিমা। আর ভারতে, ২০১৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৭০০০ মুসলিমা বর্বর হিন্দুদের কর্তৃক ধর্ষিতা হয়েছে।"**

এই হল ভারতের জুলুমের একটা ছোট্ট অংশ! যারা জুলুমের এক রামায়ণ রচনা করতে গাজওয়াতুল হিন্দ শুরু করবে!

আমরা শুধু একটি ঘটনা বলব। সবাই তা জানেন! ধর্মমত নির্বিশেষে সবাইকেই এই পাশবিকতা স্পর্শ করেছে... হ্যা, আসিফার কথাই বলছি! জম্মু কাশ্মিরের ৮ বছরের মুসলিম মেয়েশিশু!

চিত্রঃ আসিফা বানু, মরে গিয়ে উম্মতকে জাগিয়ে গেলেন

মন্দিরের পুরোহিত আর পুলিশ আসিফাকে অপহরণ করে সপ্তাহকাল আটক ও গুম রেখে ধর্ষণ করে, পাথরের আঘাতে মাথা থেঁতলিয়ে হত্যা করে! এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে ওঠে দুনিয়ার বিবেক, দুনিয়ার মুসলিম! আমরা এই ঘটনার চার্জশীট সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করে দিচ্ছি-

"মুসলমানদের হটাতেই জম্মুতে ধর্ষণ ও খুন ৮ বছরের কন্যা শিশুকে? শিশু হত্যার বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। ভারত শাসিত জম্মু-কাশ্মির রাজ্যে একটি আট বছরের কন্যা শিশুকে অপহরণ, ধর্ষণ এবং হত্যার যে মামলার তদন্ত করছিল সেই রাজ্যের পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ, তারা আদালতের কাছে চার্জশীট পেশ করেছে। তদন্তে ঘটনার যে বিবরণ উঠে এসেছে, তা এক কথায় বীভৎসতার চূড়ান্ত পর্যায়।

এও বলা হয়েছে চার্জশীটে, যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী যাযাবর সম্প্রদায়কে হিন্দু প্রধান এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আর তাদের মনে আতঙ্ক তৈরি করার জন্য ঐ ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

অপহরণ, ধর্ষণ আর হত্যার ঐ মামলায় আটজন অভিযুক্তের মধ্যে চার জন পুলিশ কনস্টেবল বা কর্মকর্তা। এদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তবে তাদের মুক্তির দাবীতে আর গোটা ঘটনা কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো সিবিআইকে দিয়ে তদন্ত করানোর দাবীতে জম্মু অঞ্চলে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো বিক্ষোভ দেখিয়েছে, রাস্তায় নেমেছিলেন জম্মু বার এসোসিয়েশনের সদস্যরা। এ হল ভারতীয় আইনজীবীদের মানবতা (!)। তদন্তে ঘটনার যে বিবরণ উঠে এসেছে, তা এক কথায় বীভৎসতার চূড়ান্ত পর্যায়। এই ঘটনা নিয়ে ওই সব বিক্ষোভে দেখা গেছে ভারতের জাতীয় পতাকাও।

কী অভিযোগ আনা হয়েছে চার্জশীটে?

জম্মু-কাশ্মির রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ বলছে, আট বছরের ঐ কন্যা শিশুকে জম্মু-র কাঠুয়া জেলায় তার বাড়ির কাছ থেকে অপহরণ করা হয়েছিল।

সাত দিন পরে তার মৃতদেহ পাওয়া যায় কাঠুয়া জেলারই বসানা গ্রামে।

তদন্তের শুরুতেই দেখা যায় যে ওই কন্যা শিশুর খোঁজ করতে পুলিশ কর্মীরা যখন জঙ্গলে গিয়েছিলেন, তার মধ্যেই এমন দুজন ছিলেন, যারা মৃতদেহটির পোশাক পরীক্ষার জন্য পাঠানোর আগে একবার জলে ধুয়ে নিয়েছিল। তল্লাশি চালিয়ে বসানা গ্রামের একটি মন্দির থেকে কিছু চুল খুঁজে পান তদন্তকারীরা। তাঁদের সন্দেহ হয় যে ঐ চুল অপহৃত কন্যা শিশুটির হতে পারে। চার্জশীটে বলা হয়েছে, ওই মন্দিরের দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন সাঞ্জি রাম নামে যে ব্যক্তি, তিনিই নিজের পুত্র আর ভাইপোর সঙ্গে ওই কন্যা শিশুকে অপহরণ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। যাযাবর সদৃশ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করাই উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তারা ওই এলাকা ছেড়ে চলে যায়।

চার্জশীটে পুলিশ এটাও উল্লেখ করেছে যে ধর্ষণের আগে ঐ মন্দিরে কিছু পুঁজোও করা হয়। ৬০ বছর বয়সী সাঞ্জি রাম, তার ছেলে বিশাল আর নাবালক ভাইপো, চার পুলিশ কর্মী এবং আরেক ব্যক্তি

গোটা ঘটনায় সরাসরি যুক্ত। ঐ কন্যা শিশুকে অপহরণ করে নিয়ে আসার পরে তাকে মাদক খাইয়ে অচেতন করে রাখা হয়েছিল। তার মধ্যেই তাকে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয়।

অভিযুক্তদের মধ্যে যে নাবালক রয়েছে, সে তার চাচাতো দাদা সাঞ্জি রামের ছেলে বিশালকে উত্তর প্রদেশের মীরঠ শহর থেকে ডেকে আনে ফোন করে যাতে, সে-ও ওই কন্যা শিশুটিকে ধর্ষণ করতে পারে।

চার্জশীটে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, টানা ধর্ষণ করার পরে যখন অভিযুক্তরা ঠিক করে যে এবার ওই কন্যা শিশুটিকে মেরে ফেলার সময় হয়েছে, তখন একজন অভিযুক্ত পুলিশ কর্মী অন্যদের বলে, "এখনই মেরো না। দাঁড়াও। আমি ওকে শেষবারের মতো একবার ধর্ষণ করে নিই।"

তারপরে ওই পুলিশ কর্মী নিজে চেষ্টা করে কন্যা শিশুটিকে হত্যা করতে, কিন্তু সে ব্যর্থ হয়। শেষে নাবালক অভিযুক্তই ওই কন্যা শিশুকে হত্যা করে। তার মৃত্যু নিশ্চিত করতে মাথা থেঁতলে দেওয়া হয় একটা পাথর দিয়ে।

ময়নাতদন্তে জানা গেছে যে ওই কন্যা শিশুটিকে মাদকের বড়ি খাইয়ে তারপরে ধর্ষণ করা হয়েছে।

অভিযুক্তদের পক্ষ নিয়ে বিক্ষোভ-

ক্রাইম ব্রাঞ্চের তদন্তে যখন একের পর এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হতে থাকেন, তখন থেকেই শুরু হয় প্রতিবাদ।

প্রথমে স্থানীয় একটি সদ্য গঠিত হিন্দু সংগঠন বিক্ষোভে নামে। সেখানে হাজির ছিলেন বিজেপির বেশ কিছু নেতা-কর্মী। তাদেরই একজন, বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক ও বিধানসভার সদস্য অশোক কউল বিবিসির প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছিলেন, "এলাকার মানুষের সঙ্গে তো থাকতেই হবে"

তবে এবার বিক্ষোভে নামে আইনজীবীরা। গ্রেপ্তারীর প্রতিবাদে জম্মুতে যে হরতাল হয়েছিল ১১ই এপ্রিল, তাতে যুক্ত হয়ে রাস্তায় নেমেছিল বার এসোসিয়েশন। ক্রাইম ব্রাঞ্চের কর্মকর্তারা যাতে চার্জশীট পেশ না করতে পারেন, তার জন্য রীতিমতো ঘেরাও চলতে থাকে।

আদালত চত্বরেই চলতে থাকে স্লোগান। শেষমেশ অনেক রাতে ক্রাইম ব্রাঞ্চের কর্মকর্তারা চার্জশীট জমা করতে সক্ষম হয়।

**** হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন কি পরিমাণ মাত্রা ধারন করেছে এবার একটু বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন।***

এক ৮ বছরের কিশোরী মুসলিম বোনকে কয়েকজন মালাউনরা মিলে পালাক্রমে ধর্ষণ করেও বাঁচতে দেয়নি, তার মৃত্যু নিশ্চিত করতে মাথা থেঁতলে দেওয়া হয় একটা পাথর দিয়ে! আর এই ধর্ষক ও খুনিদের পক্ষ নিয়ে হরতাল, মিছিল, আন্দোলন করে নগ্ন হিন্দুত্ববাদীরা! হ্যা, অনেক

হিন্দুরাও আবার আসিফা হত্যায় শোক প্রকাশ করে বিচারের দাবি জানিয়েছে। কিন্তু আমাদের আলোচনা তাঁদের নিয়ে নয়, তাঁদের হিন্দুত্ববাদী ইসলাম বিরোধী দল ও আদর্শ নিয়ে।

আমরা এখন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে প্রামাণিক আলোচনা করব। তথ্যগুলির অধিকাংশ অনলাইন টিম "অনুসন্ধিৎসু"র মোদিকে নিয়ে তৈরি করা ভিডিওর কল্যাণে পাওয়া-

মোদি,

ভারতের ১৪ তম প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু মোদির আরেকটি পরিচয় আছে। প্রধানমন্ত্রী হবার আগে মোদি পরিচিত ছিল **গুজরাটের কসাই** হিসেবে। এ পরিচয়ের পেছনের গল্প আর মতাদর্শ সম্পর্কে অনেকেই হয়তো জানেন না। কিন্তু এ আদর্শকে না বুঝলে মোদিকে বুঝা সম্ভব না।

গুজরাটের কসাই এবং আরএসএস (RSS)...!

চিত্রঃ RSS এর সাথে মোদির কিছু ছবি। প্রথম দুটি ছবি যখন RSS এর কর্মী ছিল, তৃতীয়টি যখন প্রধানমন্ত্রী

বুকার প্রাইজ বিজয়ী ভারতীয় লেখক ও একটিভিস্ট অরুন্ধতী রায় বলেন,

"আমি শুধু আপনাদের এ মানুষটি সম্পর্কে জানাতে চাই, সে (নরেন্দ্র মোদি) আরএসএস-এর একজন সদস্য যার পূর্ণরূপ হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। এটি গঠিত হয়েছিল ১৯২৭ সালে ইতালির ফ্যাসিস্টদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। হিটলারের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে। তাদের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠতম মহানায়কদের একজন হলো এডলফ হিটলার। তারা প্রকাশ্যে খোলাখুলিভাবে এডলফ হিটলারের প্রশংসা করে। আর আমি আপনাদেরকে তাঁদের বইয়েরও কিছু অংশ পড়ে শুনাবো।

‘২০০২ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিল মোদি, ট্রেনে করে কিছু তীর্থযাত্রী ফিরছিল বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে তোলা মন্দিরের পূঁজা শেষ করে। সেই ট্রেনে আগুন জালানো হয়েছিল। কেউ জানেনা কে আগুন দিয়েছিল। ৫৭ জন তীর্থযাত্রী আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিল। সে ঘটনার পর মোদির ছত্রছায়ায় উন্মত্ত হিন্দুরা গুজরাটে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। তারা জ্বালাও-পোড়াও, হত্যা ও ধর্ষণ করেছিল। আর প্রায় এক থেকে দুই হাজার মুসলিম গুজরাটের রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে গণহত্যার শিকার হয়েছিল। এক লক্ষ মানুষকে বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যারা হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল পুলিশ তাদের সাহায্য করেছিল। সেখানে বিধানসভার একজন প্রতিনিধি ছিলেন যার নাম ছিল এহসান জাফরী। যিনি মোদির বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়াবার সাহস করেছিলেন। প্রায় ২০,০০০ উন্মত্ত হিন্দু তার বাড়ি ঘিরে ফেলে। সাহায্যের জন্য তিনি প্রায় দুইশত ফোনকল করেছিলেন। পুলিশের গাড়ি সেখানে পৌঁছেছিল কিন্তু কিছু না করেই ফিরে গিয়েছিল।

উগ্র হিন্দুরা বাড়িটি ঘিরে রেখেছিল। এহসান জাফরী বের হয়ে আসলেন। তার বাড়িতে অনেক মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। বের হয়ে তিনি বললেন আমাকে যা খুশি কর কিন্তু মহিলাদের ছেড়ে দাও। আমার বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের ছেড়ে দাও।

কিন্তু তারা প্রথমে তার হাত দুটো কেটে ফেলল। তারপর পা দুটোও কেটে ফেলল। ঘরের চারপাশে তার শরীর টেনে-হিঁচড়ে বেড়ালো! তারপর তার বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া সবাইকে মেরে ফেলল। আশ্রিত নারীদের ধর্ষণ করার পর আগুনে পুড়িয়ে মারল আর মোদী ঘটনার পর বলল দেখেন, "কোন ক্রিয়া থাকলে তার তো একটা প্রতিক্রিয়াও থাকবে!"

চিত্রঃ এহসান জাফরী এবং আগুনে ছাড়খার হওয়া তার বাড়ির মেঝেতে পরিত্যক্ত নেমপ্লেট

আর মোদি যে সংগঠনের সদস্য ছিল সেটার কিছু বক্তব্য আমি এখন আপনাদের পড়ে শোনাতে চাই। এখানে we or Our Nationhood Defined নামক বই থেকে নেয়া কিছু উদ্ধৃতাংশ দিচ্ছি। বইটির লেখক হলো এম এস গোলওয়ালকার, সে পরবর্তীতে ১৯১৪ সালে RSS এর প্রধান হিসেবে ড. হেডগেওয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল। সে লিখেছে- "হিন্দুস্তানে মুসলিমদের পদার্পণের সেই অশুভ দিনের পর থেকে এখনও পর্যন্ত হিন্দু জাতি বীরত্বের সাথে আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। জাতিগত চেতনা জাগ্রত হয়েছে। এই হিন্দুস্তান হল হিন্দুদের ভূমি। এখানে হিন্দুরা বসবাস করবে এবং শুধু তারাই বসবাসের অধিকার রাখে। বাকিরা সবাই জাতীয় স্বার্থ ও লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতক এবং শত্রু। ভদ্র ভাষায় বললে অপদার্থ। বহির্জাতিসমূহ হিন্দুস্তানে হয়তো থাকতে পারে তবে হিন্দু জাতির নিকট সম্পূর্ণ পরাধীন হিসেবে। কোন প্রকার অধিকার কোন প্রকার দাবি-দাওয়া ছাড়া। অগ্রাধিকার তো দূরের কথা এমনকি নাগরিকত্বেরও অধিকার ছাড়া। নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষায় জার্মানি বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল সেমিটিক ইহুদী জাতিকে নির্মূল করে। জাতিগত গর্বের সর্বোচ্চ চূড়া জার্মানিতে অর্জিত হয়েছিল। এর মাঝে আমাদের হিন্দুস্তানের জন্য উত্তম শিক্ষা ও উপকারিতা আছে।" *(We or Our Nationhood Defined)*
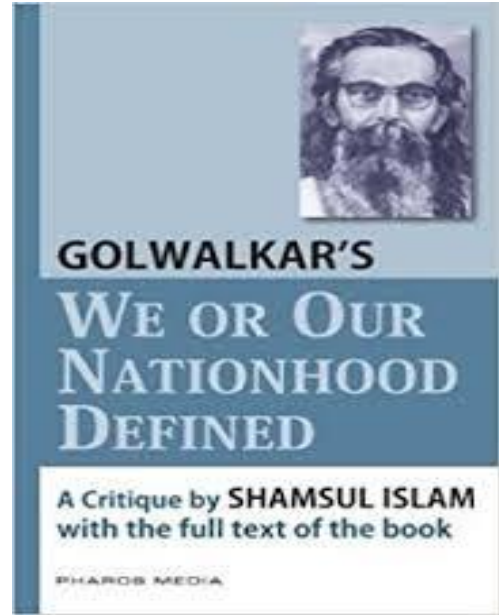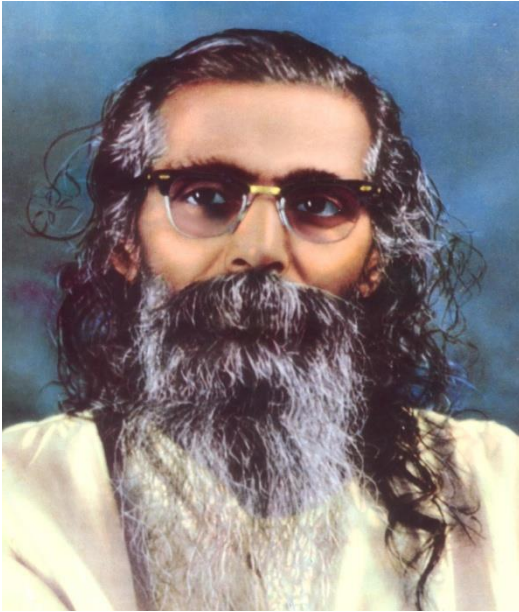
চিত্রঃ গোলওয়ালকার এবং তার We Or Our Nationhood Defined বইয়ের প্রচ্ছদ ছবি

২০০০ সাল নাগাদ আরএসএস এর ৬০ হাজারেরও বেশি শাখা গঠিত হয়েছিল এবং ৪০ লাখেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবকদের সৈন্য গড়ে উঠেছিল (বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবীদের সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ) যারা ইন্ডিয়া জুড়ে এই মতাদর্শ প্রচার করে যাচ্ছে।"

হ্যা, সত্যিই, ভারতে হিন্দুদের বাইরে কেউ থাকতে হলে নাগরিকত্ব ছাড়াই থাকতে হবে! ইতিমধ্যে আসামের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের নাগরিকত্ব বাতিল, বাড়িঘর ভাঙচুর, স্থানীয় তৃণমূল থেকে ওপেন

টিভিতে গণহত্যার হুমকি, লুটপাট এর অব্যবহিত পরেই নতুন করে যুক্ত হয়েছে কর্নাটকের প্রায় ১৫ লক্ষ মুসলিমদের নাগরিকত্ব বাতিল করা। ইয়া কারীম!

এই আদর্শ হল হিন্দুত্ববাদের আদর্শ যা আজ রাষ্ট্রীয়ভাবে হিন্দুস্তানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ভারতের মুসলিমদের জন্য, উপমহাদেশের মুসলিমদের জন্য কি অপেক্ষা করছে...!!!

ভারত নিয়ে কোন বিশ্লেষণই চলেনা। কেননা হাদিসে ভারতের ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। হাদিস অনুযায়ী ভারত বিরোধীদের মর্যাদাও সীমাহীণ। তারা বেঁচে থাকলে জাহান্নাম থেকে মুক্ত, মারা গেলে শহীদ! সুতরাং যারা ভারতের পক্ষে আছে, ভারতের সঙ্গে থাকে, ভারতের এজেন্ট, ভারতবিরোধী মুজাহীদদের বিরোধিতা করে তাদের ঈমানের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা উচিত! নিজেকে প্রশ্ন করুন-আপনি একজন ভারতের বন্ধু না ভারতবিরোধী?

অতএব কল্পনা-বিলাসিতার সময় নেই। হিন্দের যুদ্ধে অংশ নিবে সমস্ত হিন্দুরা, সমস্ত মুসলিমরা, সমস্ত বৌদ্ধরা। আর অংশ নিবে ভারতের নিয়মিত ১৪ লাখ সৈনিক এবং রিজার্ভ ২৩ লাখ, পাকিস্তানের নিয়মিত সৈনিক ৫ লাখ এবং রিজার্ভ ৫ লাখ, বাংলাদেশের সাড়ে তিন লাখ নিয়মিত ফোর্স, মায়ানমারের ৪ লক্ষের অধিক নিয়মিত ফোর্স। অর্থাৎ প্রায় ৫৫ লাখ সৈনিকের অংশগ্রহণের যুদ্ধ হবে 'গাজওয়াতুল হিন্দ'। এর বাইরে বিভিন্ন দল-উপদল, সাধারণ নাগরিকসহ কি পরিমাণ অংশ নিবে তা অনুমানের বাইরে।

*10 Lacs = 1Million

	India	Pakistan
Total Soldiers	37 lacs, 73 thousand, 300	11 lacs, 47 thousand, 500
Soldiers on Duty	14 lacs, 14 thousand	5 lacs, 50 thousand
Reserved Soldiers	23 lacs, 71 thousand, 900	5 lacs, 28 thousand
Pera Military	10 lacs, 89 thousand, 700	3 lacs, 2000

চিত্রঃ ভারত-পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর তুলনামূলক পরিসংখ্যান

সুতরাং এ যুদ্ধটি কত জটিল এবং বহুমুখী ভয়ঙ্কর হবে তার কি কোন সীমা-পরিসীমা আছে? কোন ভাবেই কি এই যুদ্ধের তীব্রতা হিসেব করা যাবে? কেউই কি এই যুদ্ধ থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে? অধিকন্তু আফগানিস্তানে তালিবানের পুনরুত্থান এই যুদ্ধকে আরো বেগবান করবে। ইতিমধ্যে তারা আফগানিস্তানের প্রায় ৮০ শতাংশ ভূমির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে এবং এক নতুন শক্তি, যাদের ৩০ বছরের বেশি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হয়েছে। এবং রাশিয়া-আমেরিকাকে পরাজিত করা খোরাসানের (আফগানিস্তান) এই বাহিনীও অংশ নিবে এই যুদ্ধে। এর বাইরে চীন, রাশিয়া, আমেরিকা এবং অন্যান্য শক্তি।

চিত্রঃ শক্তিশালী তালিবান মুজাহিদ ও তাঁদের নিয়ন্ত্রিত ভূমির মানচিত্র

এদিকে আরাকান-আসামের পর শ্রীলঙ্কার মুসলিমদের ওপরও নির্যাতনের খড়গ নেমে এসেছে। ঘর-বাড়ির সাথে মাসজিদগুলো ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। জুমু'আর নামাজ পড়ার পরিবেশও বিনষ্ট

হয়েছে এবং মিডিয়ার মাধ্যমকে উম্মাহকে ধোঁকা দিতে কিছু কথিত মানবতাবাদী (!) পুলিশের প্রহরায় খোলা আকাশের নীচে মুসল্লীরা জুমু'আর নামাজ আদায় করেছে।
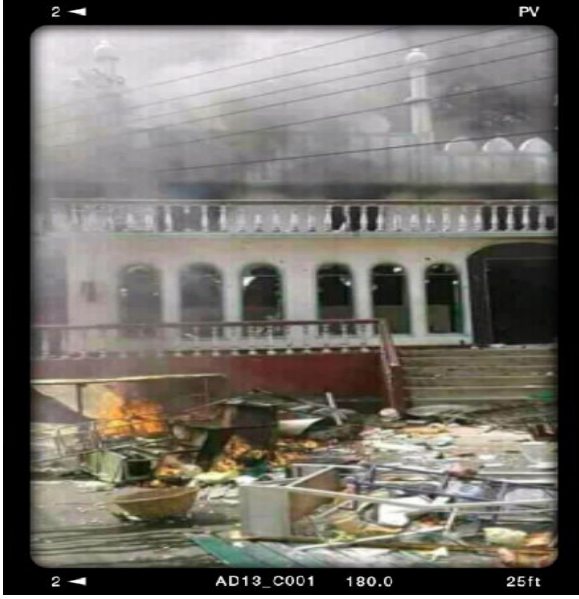
চিত্রঃ শ্রীলঙ্কায় ভেঙে ফেলা মসজিদ, এছাড়াও অসংখ্য বাড়িঘর ভাঙচুর ও জ্বালাও-পোড়াও করা হয়েছে

যেখানেই কোন মুসলিম পাওয়া যাচ্ছে আক্রমন করা হচ্ছে। শ্রীলংকান ক্রিকেটার কুমার সাঙ্গাকারা এই সাম্প্রদায়িক আক্রমনের নিন্দাবাদ জানিয়েছে এবং তা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। ভারত, আরাকানে আক্রমনের কোনরকমের একটা ছুঁতো দাঁড় করালেও শ্রীলঙ্কার ব্যাপারে কি বলবেন? আসলে সারা দুনিয়াতেই ইসলামের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছে। তার যৎকিঞ্চিত মহড়ামাত্র এগুলি!

চীনের ব্যাপারে জনশ্রুতি- চীন কখনো ভীন দেশে আক্রমন করে উপনিবেশ কায়েম করেনা। অথচ এই চীনই আমাদের পূর্ব তুর্কীস্থান দখল করে জিনজিয়াং প্রদেশ নামকরণ করেছে। ষাট এর দশক থেকে প্রায় অর্ধ কোটি মুসলিম হত্যা করেছে। ইসলামিক নাম রাখা নিষিদ্ধ। রমাদানে রোজা রাখা নিষিদ্ধ। কেউ যে রোজা রাখেনি তার প্রমাণস্বরূপ পানাহার করে দেখাতে হয় (!) মুসলিম পরিবারকে চীনা কর্মকর্তাদের সাথে রাত যাপনে বাধ্য করা হচ্ছে! কেন? কোথায় গেল গণতন্ত্র? সমাজতন্ত্র? সাম্যবাদ? অহিংস নীতি?

কে বৌদ্ধ বার্মিজদের সাহস ও শক্তি যোগাল মুসলিম নিধনে? কারা আরাকানের খনিজ সম্পদ নিতে চীন অবধি পাইপলাইন বসাল? আসলে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কতইনা সত্য বলেছেন! "সকল কুফর (কাফের) এক জাতি, এক মিল্লাত"।

সুতরাং এই যুদ্ধ থেকে কেউই কি গাফেল থাকার, নিস্তার অথবা রেহাই পাওয়ার কল্পনা করতে পারে? যেখানে আরাকান, আফগান, ইরাক, ইরান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, লিবিয়া, সিরিয়া, সৌদি

আরবসহ পুরো ইউরোপ তথা গোটা বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ তথা মালহামাতুল কুবরায় লিপ্ত থাকবে। কোন মানুষের জন্যেই এমন কোন ভূমিতে গমন করা সম্ভব হবে না যেখানে যুদ্ধের উত্তপ্ত অগ্নি আর ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েনি! এই যুদ্ধের প্রচন্ডতা বুঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে নিহতের রক্তে ঘোড়ার খুর ডুবে যাবে!

সুতরাং গাজওয়াতুল যখন যেখানেই শুরু হোক না কেন-একটু ক্ষনকালেই পুরো উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা তাদের সর্ব শক্তি দিয়ে, উন্নত অস্ত্র-শস্ত্র আর মিত্রদের নিয়ে প্রতিপক্ষের ভূখন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এক ভোর বা এক সন্ধ্যাতে সমগ্র হিন্দুস্তান আক্রান্ত হবে। মাথাছাড়া দিয়ে ওঠবে তখন সমস্ত বিদ্রোহী শক্তি। ইতিমধ্যে কাশ্মির সীমান্তে ৭ লাখ সেনা মোতায়েন করা আছে! যুদ্ধাবস্থার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে উভয় দেশের সেনাবাহিনী।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের অবস্থান ও ভূমিকা

আমরা এই যুদ্ধে পাকিস্তানের অবস্থান ও ভূমিকা কি হবে সেই আলোচনাটাও সেরে ফেলতে চাই। কেননা অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে নিশ্চয় পাকিস্তান একটি মুসলিম দেশ, তবে মুজাহিদীনরা পাকিস্তানের বিপক্ষেও লড়বে কেন? কেনই বা ভারত-পাকিস্তানের বাইরে তারা আলাদা পক্ষ। সচেতন মুসলিম মানেই এর কারণ জানেন, তবুও কিছু কথা পেশ করছি।

পাকিস্তান একটি ক্বায়েমী স্বার্থবাদী নিকৃষ্ট রাষ্ট্র। ইসলামের শুধু নাম ভাঙিয়ে চলাটাই এই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। মূলত ইসলামকে তারা নিজেদের আঁস্তাকূড়ে নিক্ষেপ করেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে বৃটিশ সেনাবাহিনীর আদর্শে। নীচের একটি ছবি (স্ক্রীনশট) থেকে আমরা এর উৎপত্তি ও বিকাশসংক্রান্ত কিছুটা ধারণা নিতে পারি-

পাকিস্তান আর্মি সম্পূর্ণরূপে একটি ইসলামিক ও জিহাদি আর্মি... এর একমাত্র সমস্যা হচ্ছে এর অধিকাংশ রেজিমেন্ট পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বেই গঠন করা হয়েছে কুখ্যাত ব্রিটিশ জেনারেল 'লর্ড' কিচেনারের হাতে। এর গঠনের পর প্রথম আর্মি চিফ ছিলেন ফ্রাঙ্ক মেসারভি, একজন ব্রিটিশ জেনারেল। ডগলাস ডেভিড গ্রেসি, আরেকজন ব্রিটিশ জেনারেল ছিলেন এর দ্বিতীয় আর্মি চিফ। ব্রিটিশ অফিসার ব্রিগেডিয়ার এঞ্জেল এর প্রাথমিক ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান 'পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি' এর গোড়াপত্তন করেন। আরেক জন ব্রিটিশ কর্নেল গ্রেন্ট টেইলর 'এসএসজি' – এর কমান্ডো ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেন। খুব একটা যৌক্তিক মনে হচ্ছে না?
যদি দুই অভিজাত ইংরেজ 'স্যার' ডুরেন্ড এবং 'স্যার' রেডক্লিফ একটি ইসলামি রাষ্ট্রের (ইসলামের দূর্গ) সীমা নির্ধারণ করতে পারেন, তাহলে কেন কিছু ব্রিটিশ ব্যক্তি একটি ইসলামিক আর্মির ভিত্তি দাঁড় করাতে পারবেন না?

চিত্রঃ ছবি আস-সাহাব রিসার্জেন্স ম্যাগাজিন থেকে

এই হল পাক সেনাবাহিনীর আদত ও ইতিহাস! পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই ভোগবাদ, বিলাসিতা, বর্বরতা আর নিজেদের হীন স্বার্থের দাসত্ব করে আসছে। মানব রচিত বিধান, কুফুরী শাসন ব্যবস্থা, বিদেশী পরাশক্তির গোলামি আর ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে এমন কোন জঘন্য-নিকৃষ্ট কর্ম নেই যা তারা করতে পারেনা। এদের বর্বরতা আর খোদাদ্রোহিতার প্রমাণ বাংলাদেশের মানুষের চেয়ে অন্য কারো বেশি জানার কথা নয়...

পাকিস্তান হল সেই দেশ এবং পাক সেনাবাহিনী হল সেই বাহিনী যারা তাদেরই ভূমিতে (পূর্ব পাকিস্তান) জুলুম-শোষণ করেছিল, '৭১ এ নিজ দেশের নাগরিকদের এবং স্বীয় মুসলিম ভাইদের গণগত্যা করেছিল, আপন ধর্মীয় লাখো মুসলিম মা বোনদের ধর্ষণ করেছিল (!)।

আজকের পাক সেনাবাহিনী হল সেই বর্বর দ্বীনহীন বাহিনীর আপডেট ভার্সন (!), যারা নিজেদের নোংরামি আর পাশবিকতায় পূর্ববর্তীদের ছাড়িয়ে গেছে। তারা পাকিস্তানের হাজার হাজার তাওহিদী মুসলিমদের জেলে ভরে রেখেছে, আল্লাহর দ্বীনের আলেমদের কারাগারে রেখেছে অথবা হত্যা করেছে- যারা শরীয়তের কথা বলে।

আমেরিকাকে খুশি করতে ওয়াজিরিস্থানে পাক সেনাবাহিনী গণহত্যা চালিয়েছে, লাখো মুসলিমকে বাস্তুচ্যুত করেছে। সোয়াতে তারা ভাষায় প্রকাশের অযোগ্য হত্যাকান্ড ও পাশবিকতা চালিয়েছে শুধুই সন্ত্রাস দমনের নামে আমেরিকাকে খুশি করতে। '৭১ এর পর তারা পুনরায় তাদের নিজেদের নাগরিকদের এমন সীমাহীন অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ চালালো যার উদাহরণ শুধু মায়ানমারের বৌদ্ধ সন্ত্রাসী সেনাবাহিনী-ই হতে পারে!

আমরা সোয়াত-ওয়াজিরিস্থানে চালানো বর্বরতার এক নির্মম উপখ্যান থেকে কিছু ছবি দিচ্ছি যা ড্রোন হামলার মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছিল। এবং বেশিরভাগই ছিল বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিয়ে শাদি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। শতভাগই নিহত হয়েছে সাধারণ নাগরিক।

চিত্রঃ ড্রোন হামলায় নিহতদের লাশ

চিত্রঃ ড্রোন হামলায় নিহত আরও কিছু শিশুর লাশ, স্বজনদের আহাজারি

এই চিত্র অসংখ্য আর সীমাহীন এর বর্বরতা! যা প্রকাশ হয়েছে তার চেয়ে নির্মম ও বিশদ হয়েছে যা মিডিয়ার আড়ালে ঘটেছে! আমরা শুধু লাল মসজিদ জামেয়া হাফসার পাশবিক গণহত্যার কথাই উল্লেখ করব-

পারভেজ মোশাররফের সরকার মসজিদে আমীর হামজা শহীদ করে দিলে মাদরাসা জামেয়া হাফসার ছাত্রীরা মাদরাসা প্রাঙ্গণে অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদ করে ও মসজিদ পুনঃনির্মাণের দাবি জানায়। পাকিস্তানের সকল উলামায়ে কেরাম তাঁদের সমর্থন জানায়। তাওহিদী জনতা ও উলামায়ে কেরামে উত্তাল হয়ে ওঠে ইসলামাবাদ। জামেয়া হাফসা হয়ে ওঠে ঈমান ও উচ্ছ্বাসের প্রতীক। কিন্তু তারা কি জানত পাকিস্তানের দালাল সরকার আসলে বিক্রিত পণ্য? যারা নিজেদের দেশকে কাফেরদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে নিজেরাও তাদের খাতায় নাম লিখিয়েছে ক্ষমতা, অর্থজৌলুস আর প্রবৃত্তির লিপ্সা মিটাতে! যাদের কাছে ইসলামের কোনই মূল্য নেই এবং যাদের অন্তরে ইসলামকে চিরতরে মিটিয়ে দেবার রয়েছে ঘৃণ্য নেশা!

সেদিনের জামেয়া হাফসার মেয়েদের সেই ঈমানদীপ্ত সভা, ভাষণ এবং উম্মতের নারীদের সম্মান ও গৌরবের একখন্ড চিত্র জানতে, দেখতে পারেন নিচের লিংক থেকে ভিডিওটি-

https://m.youtube.com/watch?v=_tUlxCiA2zs।

জামেয়া হাফসার এক ছাত্রীর মর্মস্পর্শী সাক্ষাৎকার-

https://m.youtube.com/watch?v=MZx6-UMQbvg

অথবা Jameza Hafsa লিখে ইউটিউবে সার্চ দিয়েও দেখতে পারবেন।

নানা টাল-বাহানা ও নাটকের পর ভোর রাতে জামেয়া হাফসা লাল মসজিদে অপারেশন পরিচালনা করে দালাল সরকার ও তার মুরতাদ বাহিনী। এক মসজিদকে বাঁচাতে ধ্বংস হতে হয় আরেক মসজিদকে। শহীদ হতে হয় উম্মতের শ্রেষ্ঠ আলিম, মুসল্লি, ছাত্র ও ছাত্রীদের। জামেয়া হাফসার মুহতামিমা উম্মে হাসানের বই **"লাল মসজিদ ট্রাজেডি; কি ঘটেছিল আমাদের সাথে"** এ তাহরিকে তলবা ও তলিবাত আন্দোলনের পক্ষ থেকে লেখা ভূমিকা থেকে কিয়দাংশ তুলে দিচ্ছি-

মাওলানা আব্দুল্লাহ শহীদ (রাহিঃ) এর পরিবারে জন্ম গ্রহণের সৌভাগ্য ও সুবাদে মোহতারামা **উম্মে হাসান** ত্যাগ ও কুরবানীর পরম পরাকাষ্ঠা লাভ করেছিলেন। মাওলানা আব্দুল আযীযের পবিত্র সাহচর্যে -ব্যক্তিত্ব, একনিষ্ঠতা ও আল্লাহভীতি এক কথায় সবকিছুই পূর্ণ মাত্রায় তার মাঝে অনুপ্রবেশ করেছিল।

চিত্রঃ মাদরাসা প্রাঙ্গণে প্রতিবাদরত জামেয়া হাফসার ছাত্রীরা।

তিনি এবং মাওলানা আব্দুল আযীয দুজনে মিলে যেয়ে স্বপ্নের চাঁদর বুনার মতোই ইসলামের নারীদের এবং সম্প্রদায়ের শিশু-কিশোরদের জন্যে পর্দা ও দ্বীনি পরিবেশ তৈরি এবং দ্বীনের প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে মাদ্রাসা **জামেয়া সাইয়্যেদা হাফসা (রাঃ)** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন....

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয ও মোহতারামা উম্মে হাসানের ইখলাস, দুয়া ও অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে দেখতে দেখতেই এক নেহায়েত ছোট মাদরাসা ইসলামি দুনিয়ায় নারীদের শিক্ষা-দীক্ষার এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে গেল....

চিত্রঃ জামেয়া হাফসা (বামে) ও লাল মসজিদ (ডানে)

পরস্পর মিলে তারা সমাজের অসহায় শিশুদের জন্যে একটা আশ্রয়স্থল তৈরি করলেন। বছরান্তে পড়ার শেষে যখন সম্পর্কের উন্নয়ন, ত্রাণ ও সাহায্য আসা শুরু হল তারা মসজিদ নির্মাণ করলেন।

দ্বীনকে টিকিয়ে রাখতে, হক্বের কালিমা বুলন্দ করতে এবং নেফাযে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতে নিজেদের আরাম আয়েশ ত্যাগ করে দিলেন। স্বীয় সন্তানাদি আল্লাহর রাস্তায় জবাই করে দিয়ে এবং নিজের মাদরাসাকে উৎসর্গ করে দিয়ে এক আজীমুশ্বান দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

লাল মসজিদ অপারেশনে শাহাদাত বরণকারীরা তো অবলীলায় মুক্তি ও সফলতা পেয়ে গেছে। কিন্তু মোহতারামা উম্মে হাসান এর কলিজাছেঁচা ব্যথা-কষ্ট ও সাহসিকতা কি দেখা হয়েছে- যা তার সাথে ঘটেছিল?

টানা সাত দিন ক্ষুৎ-পিপাসা, ভয়-ভীতি, ভয়ঙ্কর আওয়াজ, বোমা বিস্ফোরণ, ঝাঁকেঝাঁকে গুলির বান, বিষাক্ত ধোঁয়ার পরিত্যক্ত চারপাশ, বিক্ষিপ্ত মৃত লাশের স্তূপ, ছেলে-মেয়েদের মৃত্যু-শাহাদাতবরণ, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবাহিত রক্তের স্রোত, দেহ থেকে ছিন্নভিন্ন হওয়া মাংসপিন্ডের ছড়াছড়ি, আগুনের লেলিহান শিখা, পিপাসায় মৃত্যুকাতর শিশুরা, জ্বলে-পুড়ে যাওয়া কুর'আনুল কারীম, নষ্ট হয়ে যাওয়া হাদীসের কিতাব, গুলিতে গুঁড়িয়ে যাওয়া মসজিদের দেওয়াল দেখে বরং কল্পনা করেই মানুষের ভয়ে-যন্ত্রনায় জ্ঞান হারাবার উপক্রম হয়!

কিন্তু পৃথিবীকে বিস্ময়াভিভূত করে দিয়ে উম্মে হাসান সবর ও ধৈর্য্যের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন!

জিজ্ঞাসাবাদের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি, হৃদয়ের মানিক এক বছর বয়সী একমাত্র ছেলের শাহাদাত, তপ্ত হৃদয়ের হাহাকার, জীবনভর শ্রম-সাধনা দিয়ে গড়ে তোলা জামেয়া সাইয়্যেদাহ হাফসার ধ্বংস, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আযীয এর মামলা মুকাদ্দমার ধারাবাহিকতায় দৌঁড়াদৌঁড়ি, আদালত ও কারাগারের নৈমিত্তিক পেরেশানি, মনের গহীনে সুপ্ত থাকা রহস্য ভেদ, মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সেই লগ্ন......

চিত্রঃ লাল মসজিদ জেনোসাইডের আগে ড্রোন থেকে ছবি নেওয়া হচ্ছে

চিত্রঃ আক্রান্ত মসজিদ ফটক ও পুড়ে যাওয়া কুর'আনুল কারীম

আহ! অন্য যে কেউ হতো তো বুক ফাঁটা আর্তনাদে চিৎকার করে বলত-

"জীবন বলো অথবা ঝড়

আমরা তো জীবনের মাঝেই মৃত হয়ে আছি!"

পাকিস্তানে এই মসজিদ ধ্বংস করে দেওয়ার নজীর একটা না। এক জরিপে শহীদ করে দেওয়া সত্তরটি মসজিদের নাম এসেছে!

এই হল পাকিস্তান! নিজেদের স্বার্থে কাশ্মির আন্দোলনের হাজারো মুমিনের রক্তকে পানির দামে বিক্রি করে আজাদি লড়াইকে ব্যর্থ করেছে এই পাকিস্তান। উস্তাদ উসামা মাহমুদ (হাফি:) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল কাশ্মির ইস্যুতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করা বা সমাধান আশা করা যায় কি না? তিনি কি বলেছিলেন...!

চিত্রঃ কেমন জালেম ও নির্লজ্জ হলে নিজেদের পর্দানশীলা মেয়েদের বিরুদ্ধে নগ্ন হামলা চালাতে পারে (!)

চিত্রঃ পরিত্যক্ত, রক্তাক্ত জামেয়ার কম্পিউটার কক্ষ, বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ছাত্র-আলেমদের

আস-সাহাব উপমহাদেশঃ তাহলে কাশ্মিরে জিহাদের জন্য কি পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর প্রতি চেয়ে থাকা উচিত? পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী কি কাশ্মিরের সমস্যা সমাধান করতে পারবে?

উস্তাদ উসামা মাহমুদঃ *পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী সমাধান নয়, বরং এই সমস্যার কারণ। এ নিজেই শরীয়তের শত্রু এবং বৈশ্বিক কুফরি শক্তির গোলাম সামরিক বাহিনী, এর অতীত এবং বর্তমান দেখার পরও এর দিকে চেয়ে থাকা নিজেকে ধোঁকা দেওয়া এবং বাস্তবতার সামনে চোখ বন্ধ করে রাখার শামিল। এটা সুস্পষ্ট যে, যেই সামরিক বাহিনী নিজেদের স্বার্থ দেখে অগ্রসর হয় এবং নিজেদের ক্ষুদ্রতর লোকসান অথবা বিশ্ব গুণ্ডাদের শুধু ইশারা দেখেই জয় করা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে আসে, এই যাদের অবস্থা তারা মাজলুমদের সাহায্যের জন্য কাফেরদের সামনে কি প্রতিরোধ করবে? এটা অসম্ভব ... এটা আমাদের সামনে যে, কিভাবে ২০০৩-২০০৪ সালে ভারতের চাপের মুখে এই সামরিক বাহিনী কাশ্মিরী মুজাহিদদের সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যা দিয়েছিল, কাশ্মিরী মুজাহিদদের মানসেহরা এবং মুজাফফরাবাদের ক্যাম্পে নজরবন্দি করে রাখে এবং কাশ্মিরী মুসলমানদের যুদ্ধের ময়দানের ভেতরে হিন্দুদের দয়া ও করুণার জন্য ছেড়ে দিয়ে আসে এবং এভাবে কাশ্মির জিহাদের পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয়। আবার এটা কোন প্রথম ঘটনাও নয়; ৬৫, ৭১ এবং কারগিলেও এই সামরিক বাহিনীর এই কৌশলই ছিল। বাস্তবতা এটাই যে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী বেতনভাতা, ফ্ল্যাট এবং ক্যারিয়ারের উন্নতির জন্য লড়াই করে। স্বার্থপরতা এবং বাহ্যিক ফায়দার নাম হল সামরিক বাহিনীর চাকুরী। এই সামরিক বাহিনীই অ্যামেরিকান ডলারের বিনিময়ে উম্মতের মুজাহিদদের এবং নিজ মুসলিম জনসাধারণের রক্ত ঝরিয়ে যাচ্ছে, যে কাবায়েল (গোত্রগুলো) হিন্দুদের থেকে কাশ্মির নিয়ে পাকিস্তানের হাতে সোপর্দ করেছিল, সেই কাবায়েলের (গোত্রগুলোর) উপর আমেরিকার দাসত্ব করতে গিয়ে আগুন ও বারুদের বৃষ্টি বর্ষণ করে। আজ এর নীতিতে ভারত, আমেরিকা, ইসরায়েল অথবা কোন কাফের রাষ্ট্র এই বাহিনীর শত্রু নয়, বরং জিহাদের ফরয আদায়কারী দ্বীনের অনুসারীদেরকে এই বাহিনী শত্রু মনে করে। সুতরাং যে সামরিক বাহিনীর কাছে না মসজিদ মাদ্রাসা*

হেফাজত থাকে আর না মুসলমানদের বসতবাড়ি হেফাজত থাকে। এমন সামরিক বাহিনী কিভাবে হিন্দুদের মোকাবেলা করতে পারবে?

আমাদের অবস্থান হল জিহাদি আন্দোলনকে এই তাগুতদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা ছাড়া জিহাদ কখনও সফল হতে পারবেনা। যদি আজ ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান থেকে শুরু করে ইয়েমেন ও সোমালিয়া এবং মালি ও আলজেরিয়া পর্যন্ত জিহাদি আন্দোলনের সফল হচ্ছে, যেখানেই সব প্রতিবন্ধকতার পরও আল্লাহ মুজাহিদদের বিজয় দিচ্ছেন এবং জিহাদি আন্দোলন গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তো এর একটা বড় কারণ হল তাগুতী সামরিক বাহিনীর প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করা।"

এই পাকিস্তান শত শত মুজাহিদীনদের গ্রেপ্তার করে আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছিল। এমন কি আফিয়া সিদ্দীকি'কেও পাকিস্তান আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছিল আফগানিস্তানের পক্ষে কথা বলার অপরাধে! (আফিয়া সিদ্দীকি'র সম্পর্কে জানতে তার নাম লিখে গুগলে সার্চ দিন অথবা তারিক মেহান্নার প্রাচীর বইটি পড়া যেতে পারে)

এক জরিপে এসেছে, US ডলারের বিনিময়ে পাকিস্তান সরকার (পারভেজ মোশাররফ) ৪০০০ নাগরিককে আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। পারভেজ মোশাররফ তার আত্মজীবনী 'ইন দ্য লাইন অব ফায়ার' বইতে তা গর্বের সাথে স্বীকার করে। এবং কোটি কোটি ডলার ইনকামের কথাও জানায়।

এখন যখন আমেরিকা পাকিস্তানের প্রতি নারাজ তখন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খাজা আসিফ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে ভালোবেসে পাকিস্তান ঠকেছে। তিনি বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে' ওয়াশিংটনকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে গেছে ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের ঘাঁটি ব্যবহার করে আফগানিস্তানে ৫ হাজার ৮০০ বার হামলা চালানো হয়েছে' তিনি তার টুইটে আরো বলেন-" 'গুয়ানতানামো বে কারাগার ভর্তি করতে আমরা সাহায্য করেছিলাম। তোমাদের শত্রুকে আমরা আমাদের নিজের শত্রু বিবেচনা করেছি। তোমরা আমাদের ঘাঁটি ব্যবহার করে আফগানিস্তানে পাঁচ হাজার ৮০০টি হামলা চালিয়েছ। তোমাদের আমরা এমন উৎসাহ নিয়ে আমাদের সম্পদ দিয়ে সেবা করেছি যে, আমাদের দেশেই লোডশেডিং ও গ্যাসের ঘাটতি দেখা দিয়েছে'।"

একটি সমীকরণই যথেষ্ট। আফগানিস্তানে হামলা করার জন্যে আমেরিকাকে পাকিস্তান নিজেদের আকাশ, ভূমি, সামরিক ঘাঁটি সবকিছুই উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। সুতরাং পাকিস্তান আমেরিকার বন্ধু। আমেরিকার কোন বন্ধু কি গাজওয়াতুল হিন্দে ইসলামের জন্যে লড়াই করতে পারে? এরা তারাই যারা দাজ্জালের বাহিনী। এদের কতক কাফের এবং কতক মোনাফিক। এরা সবাই হিজবুশ শয়তান।

এই হল পাকিস্তান। যারা কখনোই গাজওয়াতুল হিন্দে ইসলামের জন্যে লড়বেনা। বরং ইসলামের এক ভিন্নরূপী শত্রু হিসেবেই অংশগ্রহণ করবে।

বাংলাদেশ পর্যালোচনা

আর বাংলাদেশের ভূমিকা কেমন হবে এই যুদ্ধে? এই হিসেবটি স্পষ্ট। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনা প্রবাহ সব স্পষ্ট করে দিয়েছে। সেনাবাহিনী, র‍্যাব, পুলিশ সবই যে তৃগুত ও বেতন-ভাতার জন্যে নিজের দ্বীন-ঈমান বিক্রয় করে ও ইসলামের সাথে গাদ্দারি করে তা আর গোপন কিছু নয়।

আমারা বাংলাদেশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাবো না। যাওয়ার দরকারও নেই। গাজওয়াতুল হিন্দ নিয়ে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ভারতের নগ্নাচারের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ মালাউন হিন্দুদের টার্নিং পয়েন্ট। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ বহুমুখী চক্রান্তে ক্লান্ত-শ্রান্ত স্বকীয়তা শূণ্য এক দেওলিয়া রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

অনন্তর বাংলাদেশ ভারতের পক্ষে যাবে '৭১ এর ঋণ শোধ করতে। ইতিমধ্যে ভারতের সাথে সামরিক চুক্তি করা হয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যে কোন সমস্যায় ভারতীয় সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ ও অভিযান পরিচালনা করতে পারবে। বাংলাদেশ আর অন্য কোন দেশ থেকে অস্ত্র ক্রয় করবেনা। ভারত থেকেই অস্ত্র ক্রয় করবে।

হতে পারে শাহ নিয়ামতুল্লাহ তার ক্বাসীদায় যে পাপচুক্তির কথা বলেছেন তা এই চুক্তি-ই! (আল্লাহ ভালো জানেন)।

(মুসলিম নেতা-অথচ বন্ধু কাফেরের তলে তলে

মদদ করিবে অরি কে সে এক পাপ চুক্তির ছলে

(৪১)

প্রথম অক্ষরে থাকিবে শীনে'র অবস্থান শেষের অক্ষরে থাকিবে নূন' ও বিরাজমান

ঘটিবে তখন এসব ঘটনা মাঝখানে দু'ঈদের

ধিক্কার দিবে বিশ্বের লোক জালিম হিন্দুদের (ক্বাসীদা শাহ নিয়ামতুল্লাহ)

ভয়ঙ্করভাবে বাংলাদেশকে হিন্দুত্বকরণ করা হয়েছে। এ দেশের প্রায় ৪০ টির বেশি জেলার এসপি-ডিসি হিন্দু। এদেশের শিক্ষাবোর্ডের প্রধানসহ বড় বড় প্রশাসনিক পদে এখন হিন্দুদের জয়জয়কার। সেই সাথে ক্রুসেডার খ্রীস্টশক্তি এদেশের মুসলিমদের ঈমানি সম্পদ লুটের জন্যে জঘন্য পাঁয়তারা করে যাচ্ছে। তাদের ছলনা, অর্থ ও চাপের ফাঁদে পা দিয়ে খ্রীস্টানও হচ্ছে অভাগা কিছু মুসলিমরা। আর বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ পাহাড়ি উপজাতি ইতিমধ্যে খ্রীস্টবাদে ধর্মান্তরিত হয়েছে। যেভাবে নিজেদের স্বার্থ, ভূ-গর্ভস্থ খনিজ সম্পদ ও মুসলিমদের সম্পত্তি ভোগ দখলের জন্যে আরাকানি

মুসলমদের জাতিগত নির্মূল করা হয়েছে, একই প্রয়াসে এ দেশের পার্বত্য অঞ্চলকেও বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার নির্মম ষড়যন্ত্র চলছে। পার্বত্য অঞ্চলের মুসলিমদের তাড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা অব্যাহত আছে। সেখানের মুসলিমরা নির্যাতিত ও নিগৃহীত হচ্ছে আধিবাসী ও মগ বৌদ্ধ দস্যুদের হাতে (!)।

আমরা দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত একটা খবর থেকে কিছু অংশ পাঠক ও সচেতন মুসলিমদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি-

“৬ জন তরুণ অফিসার, ১ মেজর, ৩ ক্যাপ্টেন ও ২ লেফটেন্যান্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর সাথে যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। ৩১২ জন সৈনিক পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের জীবন দিয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েক হাজার কিলোমিটার রাস্তার অর্ধেকের বেশী বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মিত। নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য দেশী-বিদেশী হাজার হাজার পর্যটক নীলগিরিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের যেসব স্পটে ছুটে যান তার পুরো অবদানটাই সেনাবহিনীর। নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ ও রাস্তা নির্মাণ না করা হলে রাতে থেকে নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করা দূরের কথা, এখানে কেউ যাওয়ার কল্পনাও করতেন না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে কাজ করছেন এমন একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার যে গভীর ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে তার প্রভাব পড়বে দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রামে। একই সাথে পৃথিবীর বৃহৎ সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারও এ থেকে রক্ষা পাবে না।

তিনি বলেন, ভারতের স্বার্থে সন্তু লারমাদের রক্ষায় একটি প্রভাবশালী মহল সক্রিয় রয়েছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীকে দুর্বল করার জন্য মাঠে নেমেছে। সেনা ক্যাম্প তুলে আনা এটি তারই অংশ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী রাস্তা মেরামত কিংবা ব্রীজ রক্ষার কাজ না করে দেশের ভূখন্ড রক্ষায় সক্রিয় হতে হবে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের সেনাবাহিনীর যে বীরত্বের অবদান ও সুনাম রয়েছে তা আরো বাড়িয়ে তোলার দায়িত্ব তাদেরই নিতে হবে।

মেজর জেনারেল অব এম এ মতিন, বীর প্রতীক, পিএসসি দৈনিক ইনকিলাবকে বলেন, নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শত শত অফিসার ও সদস্যকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আমরা শান্তি বাহিনীর সাথে যখন যুদ্ধ করেছি তখন কোন ক্যাম্প কেউ দখল করতে পারেনি। শান্তি চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব হারানো হয়েছে।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা এখন রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে। বাঙালীদের স্বার্থও দেখতে হবে। পাহাড়ে শান্তি বজায় রেখে বাঙালী-পাহাড়িরা যাতে বসবাস করতে পারে সেজন্য

সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। এ দেশের মানুষ পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াবে এবং তারা এটা কখনো মেনে নেবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন এমন একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে দৈনিক ইনকিলাবকে বলেন, ১৯৭৪ সাল থেকে সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় শান্তি প্রতিষ্ঠান জন্য কাজ করছে। এতে করে অনেক সেনা সদস্য ও কর্মকর্তাকে প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়েছে। শান্তি চুক্তির পর থেকে এ পর্যন্ত ২৩৮টি সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। বর্তমানে ২শ' ৫৩টি সেনাক্যাম্প রয়েছে।

তিনি বলেন, সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার করায় অস্ত্র ও মাদক ব্যবসা বেড়ে গেছে এবং পাহাড়ি সশস্ত্র গ্রুপগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এখন গুলি ও চাঁদাবাজির ঘটনা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। প্রকৃতিগত কারণেই স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষে পাহাড়ি সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। গভীর জঙ্গল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকার পরেও সেনা বাহিনী ঝুঁকি নিয়ে দেশের জন্য কাজ করে আসছে।

ওই কর্মকর্তা আরো বলেন, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির ভারত ও মায়ানমার সীমান্ত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল। ফলে সীমান্ত দিয়ে সহজেই বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ গুলো বাংলাদেশ ভূখন্ডে প্রবেশ করতে পারে। অন্যদিকে আমাদের দিক থেকে গভীর অরণ্য ও রাস্তা না থাকায় এদের শনাক্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন। তার উপর সেনাক্যাম্প কমিয়ে দেওয়ায় বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন হলে ওই অঞ্চলে বসবাসরত ৮ লাখের অধিক বাঙালীর ভূমি-সংক্রান্ত জটিলতা বাড়বে। একই সাথে পার্বত্য জেলা বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে বাঙালী-পাহাড়িদের মধ্যে সংঘাত চরম আকার ধারণ করবে। পাহাড়িদের স্বার্থ রক্ষার একপেশে আইনটি বাতিলের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনপদ উত্তাল হয়ে উঠলেও সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত লাখ লাখ বাঙালী হবে নিজ দেশে পরবাসী এমন মন্তব্য বিশেষজ্ঞদের।

তারা বলছেন, পাহাড়ে সশস্ত্র বিদ্রোহ অবসানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ১ ডিসেম্বর সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) মধ্যে যে চিন্তা মাথায় রেখে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন হলে তা বাধাগ্রস্থ হবে।

একটি দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে তিন জেলায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র ভান্ডার গড়ে তুলেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) সন্তু লারমা গ্রুপ এবং ইউপিডিএফয়ের সশস্ত্র ক্যাডাররা। একই সাথে ওই অঞ্চলে ভারত ও মায়ানমারের মাদক ব্যবসায়ী চক্রের সাথে হাত

মিলিয়ে মাদক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। সেনাবাহিনী আগের মতো সক্রিয় না থাকায় (সেনাক্যাম্প তুলে ফেলায়) আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় ও মায়ানমারের বেশ কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র গ্রুপ আস্তানা গড়ে তুলেছে জেএসএস এবং ইউপিডিএফয়ের মদদে। এর মধ্যে রয়েছে-আসামের উলফা ও আদিবাসী পিপলস আর্মি। ত্রিপুরার ন্যাশনাল ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা। মেঘালয়ের গাড়ো ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি এবং মায়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপ ।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাঙালি শূন্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনশক্তি বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় উপজাতীয়দের এনে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনসংখ্যা বৃদ্ধির কাজ চলছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর তৎপরতা শিথিল হওয়ায় এবং কোন কোন এলাকায় তাদের কোন তৎপরতা না থাকার সুযোগে ভারতীয় উপজাতীয় নাগরিকদের এনে নতুন করে বসতি গড়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ভয়-ভীতি-প্রদর্শন, অগ্নিসংযোগ, হত্যা ইত্যাদি সত্ত্বেও বাঙালি মুসলমান পরিবারগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের আবাসস্থল পরিত্যাগ না করলে তাদের রেশন ও প্রোটেকশন প্রত্যাহার করার জন্য একটি চক্র হুমকি দিচ্ছে বলে বাঙালীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সূত্র মতে, ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরা থেকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আত্মীয়তার সূত্র ব্যবহার করে বাঘাইছড়ি ও সাজেক এলাকার সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বসতি স্থাপন করার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন সংস্থা ও এনজিও এসব নবাগত ভারতীয় উপজাতি পরিবারের থাকা-খাওয়ার সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছে।

(এটি দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত লেখার অংশ বিশেষ)

এই লিংক থেকে আরও বিস্তারিত জানতে পারেন-

http://www.djanata.com/index.php?ref=MjBfMDZfMjhfMTNfMV8zXzFfMzMwMDE=

ভারতের বাবরী মসজিদ শহীদের মাধ্যমে আল্লাহর ঘর ভাঙার যে ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল তা অব্যাহত আছে হিন্দের সকল দেশেই। পাকিস্তানে সাত মসজিদ, মসজিদে ইবনে আব্বাস, মসজিদে আমীর হামজা, লাল মসজিদ সহ ভাঙা হয়েছে অর্ধশতকের বেশি মসজিদ। ভারতে তার হিসেবটা অগণিত। মায়ানমারের আরাকানে তো পুরো জাতিকেই নির্মূল করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদরাসা, মসজিদ কিছুই বাকি নেই। সমূলে বিনাশ করা হয়েছে। আর শ্রীলঙ্কায়ও সেই ধারা শুরু হয়ে অব্যাহত আছে। এই ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে বাংলাদেশেও। নানা অজুহাতে ভাঙা হচ্ছে মসজিদ মাদরাসা। নিকট অতীতে ভাঙা হয়েছে কুড়িল বিশ্বরোডের একটি মাদরাসা মসজিদ। এরপর হাতিরঝিলের অপরূপ ভাসমান মসজিদ ভেঙে ফেলা হল। গত ০৬-০৫-১৮ তারিখে সদরঘাটের বাইতুন নাজাত জামে মসজিদ ভেঙে ফেলার চেষ্টা করা হয়। মসজিদের প্রবেশ পথে

হ্যামার দিয়ে ধাক্কাও দেওয়া হয়। কিন্তু তাওহিদী জনতার রোশের মুখে তা স্থগিত করতে বাধ্য হয়। স্থানীয়রা ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদকে সংস্কার করে দেওয়ার দাবী জানায়! আহ! সেই লাল মসজিদ! সেই অতীত! তবুও আমরা শিক্ষা নেইনা! কতই অক্ষম ও কপালপোড়া আমরা! শত্রু-মিত্র এখনো চিনতে পারিনি!

চিত্রঃ হাতিরঝিল ভাসমান জামে মসজিদ

চিত্রঃ সদরঘাট বাইতুন নুর জামে মসজিদ , ভাঙা দরজা (লাল বৃত্তের ভেতরে)

এছাড়াও যারা সত্য ও সঠিক কথা বলছে তাঁদের নানামুখী হয়রানি, মামলা, গুম এবং হত্যার মাত্রাও সীমা ছাড়িয়েছে। নাগরিক অধিকার বিপন্ন হয়েছে।

ব আগের মতই অব্যাহত আছে। জানুয়ারি থেকে শুরু করে এই ব
১৩৮ জনেরও বেশি মানুষ বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে
সরকার কর্তৃক অনুমোদিত মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কে
এর হিসাব মতে অন্তত ১৭৯ জন মানুষ ২০১৩ সালে বিচার বহির্ভূত হত্যাকা
শিকার হয়েছে, যদিও জামাত-ইসলামের দাবি ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০
সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তাদের ১৮৪ জন কর্মী বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিব
হয়েছে। k`ẍeY অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান (k`ẍg) এইসব হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ব
অভিযোগ উঠেছে। k`ẍg সম্প্রতি হত্যা ও টাকার বিনিময়ে মানুষ গুম (কিছুদিন আ
নারায়ণগঞ্জে যা হল) করার মত ঘটনার কারণে কুখ্যাতি অর্জন করে। উইকিলি
এর ফাস করা তথ্য মতে k`ẍg হল ব্রিটিশ সরকারের ইন্ধনে আয়োজিত এব
ট্রেনিং প্রোগ্রাম। k`ẍgর বিচার বহির্ভূত হত্যা কাণ্ডের ঘটনাগুলোর জন্য আমেরিকা
প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত এই ডেথস্কোয়াড থেকে সম্প্রতি আমেরিকান সরকার দূরত্ব বজ
রাখতে বাধ্য হয়েছে। হেফাজতে ইসলামের আন্দোলনের সময় k`ẍg যে শত
মুসলিমদের (যদি হাজার না হয়ে থাকে) হত্যা করেছে তার তুলনায় অবশ্য উপ
বিবরণ কিছুই নয়। গত বছরের ডিসেম্বরে খুলনায় ঘটে যাওয়া গণহত্যার সা
k`ẍg জড়িত যেখানে তারা কয়েক ডজন নিরপরাধ মানুষকে রাতের আঁধারে হ
করে।

বাংলাদেশে আওয়ামী সরকার সেকুলারিজমের আসল রূপ প্রদ
করেছে। বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড যেন সেকুলারিজমের অন্ধ ভ
আওয়ামী লিগের জন্য যথেষ্ট নয়, বর্তমান সরকার ইসলামী চি
চেতনার লোকদের সাথে বিবাদে জড়ানোর জন্য একটি বানোয়া
বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। 'আন্তর্জাতিক বিচার ট্রাইব্যুনাল' বিচার বহির্ভূ
হত্যার জন্য আওয়ামী লিগের 'বৈধ' হাতিয়ার। প্রহসনমূলক এই ট্রাইব্যুনাল ন্যূনত
ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছতা দেখাতেও ব্যর্থ হয়েছে। এখন পর্যন্ত এক ডজনেরও বে
রাজনৈতিক নেতাকে 'যুদ্ধাপরাধী' অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। বাংলাদেশের কে
আদালতেই এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। এই সেই ট্রাইব্যুনাল যা আব্দু
কাদের মোল্লা, একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদকে ফাসিতে ঝুলানোর র
দিয়েছে। পরস্পর বিরোধী অভিযোগের উপর ভিত্তি করে যা তৈরি হয়েছিল সরক

চিত্রঃ স্ক্রীনশট আস-সাহাব রিসার্জেন্স থেকে

এছাড়া বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদ কায়েমের অপচেষ্টা নিয়ে আরও কিছু বিষয়ে চোখ বুলিয়ে নিই-

- বাংলাদেশে কায়েম হবে হিন্দুত্ববাদ:

  https://m.youtube.com/watch?v=R--8mqL00E0

○ কিছুদিন আগে ভারতের আসামের কাজীরাঙাতে ৩৮১টি মুসলিম পরিবারকে উচ্ছেদ করেছে পুলিশ। উচ্ছেদ অভিযানে আঞ্জুনা খাতুন (১৬) ও ফকরুদ্দিন (২৬) নামে দুইজন মুসলমান নিহত হয়েছে এবং অনেকে আহত হয়েছে। দাবি করা হচ্ছে পরিবারগুলো নাকি বাংলাদেশী মুসলিম, তাই তাদের থাকার অধিকার নেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যাদেরকে বাংলাদেশী মুসলিম বলে তাড়ানো হচ্ছে তাদের বয়ঃবৃদ্ধরা ৬৫ সালের স্থানীয় ভোটার!

https://ow.ly/v1IB304oLQL

অন্যদিকে, বাংলাদেশে অর্পিত সম্পত্তি প্রর্ত্যাপন নামক আইন পাশ করে হিন্দুদেরকে জমি ফিরিয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। বলা হচ্ছে ৬৫ সালের যুদ্ধের সময় যে সব হিন্দু দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলো তারা এই আইন বলে পুনরায় ফেরত পাবে জমি-জমা। ইতিমধ্যে এই আইনের কারণে সারা দেশে কয়েকলক্ষ মামলা দায়ের হয়েছে এবং হিন্দুরা বাংলাদেশের একটি বড় অংশ (প্রায় এক চর্তুাংশ) এলাকা নিজেদের বলে দাবি করেছে।

পাঠক, ভারতের ৬৫ সালের ভোটারদেরকেও বাংলাদেশী মুসলিম বলে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে শত্রু সম্পত্তি গুলোকে অর্পিত সম্পত্তি বলে হিন্দুদেরকে পুনরায় বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে!

○ ভারতে বিজেপি ক্ষমতায়, সেখানে হিন্দুত্ববাদ জারি করার চেষ্টা চলছে। দেশটির সংবিধান অসাম্প্রদায়িক, কিন্তু সেখানেই মুসলিম শূণ্য করে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার নিয়েছে মোদি সরকার। কিন্তু আশ্চর্যজনক হচ্ছে বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দেশ, এই দেশও যেই আচরণ করছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশেও বর্তমানে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী নীতি অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে। আমরা কি তবে ধরে নেবো, বাংলাদেশ অঘোষিত ভারতীয় অঙ্গরাজ্য বলে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে? অন্তত বাংলাদেশের বিভিন্ন আচার-আচরণ তো সে ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

https://www.rajibkhaja.com/2016/09/blog-post_64.html?m=

○ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সিটিউটের ক্যান্টিনে বিরিয়ানিতে গরুর গোশত পাওয়ায় ক্যান্টিন ভাঙচুর, মন্দিরের নিকটবর্তী রেস্টুরেন্টে গরুর গোশত রান্না করলে মন্দির কর্তৃপক্ষের অভিযোগে রেস্টুরেন্ট মালিককে গ্রেপ্তার।

দেশকে নো বিফের আওতায় আনার প্রয়াস, হোটেলগুলোতে নো-বিফের হিড়িক, কড়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে শহরগুলোর কসাইখানাগুলোকে, অনুমোদিত ব্যবসায়ী ছাড়া কেউ গরু জবাই ও বিক্রি করলে বিব্রবতকর অবস্থায় পড়ছে, গরুর গোশত ইমপোর্টের মাধ্যমে অনুমোদিত ডিলাররা ভারত থেকে আমদানি করে সারা দেশে সাপ্লাই করছে। পল্টনের একটি প্রসিদ্ধ রেস্টুরেন্টে নো-বিফ লেখা

দেখে মালিকের সাথে কথা বলে জানা গেল ভয়ঙ্কর তথ্য- বাজারের সকল গরুর গোশতই এমনকি ছাগল-খাসির গোশতও ভারত থেকে ইমপোর্ট করা হয়, তাজা দেখাতে হাড্ডি-গোশতের সাথে রক্তও আনা হয়। এ জন্যে তিনি তার রেস্টুরেন্টে গরুর গোশত রাখেন না। উনার আশঙ্কা কে জবাই করে, আদতেই মুসলিম কি না, হালাল না হারাম- এইসব সংশয়ের জন্যেই নো-বিফ সিস্টেম (!)

বি-বাড়িয়াতে জামেয়া ইউনুছিয়ার হাফেজ ইয়াসীনকে শহীদ করার সময় সেখানকার দায়িত্বে ছিলেন একজন হিন্দু এস.আই।

○ চট্টগ্রামে একজন নারী উদ্যোক্তাকে হিন্দু পুলিশ অপহরণ করে চাদা দাবি, নির্যাতন ও সিগারেটের ছ্যাকা।

এছাড়াও প্রতিনিয়তই পত্রিকার পাতা ছেয়ে আছে মুসলিমদের ওপর হিন্দু নিগ্রহ। চাকুরীতে রয়েছে তাঁদের আলাদা সুযোগ। কেউ কেউ প্রশ্ন করার প্রয়াস পাচ্ছে- বাংলাদেশে প্রকৃত সংখ্যালঘু কারা?

হিন্দুরা না মুসলিমরা!

○ পাঠ্যপুস্তকে হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন

পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বই থেকে বাদ দেওয়া হলো-

১) দ্বিতীয় শ্রেণী: ‘সবাই মিলে করি কাজ’ – শিরোনামে মুসলমানদের শেষ নবীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।

২) তৃতীয় শ্রেণী: ‘খলিফা হযরত আবু বকর’ শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।

৩) চতুর্থ শ্রেণী: খলিফা হযরত ওমর এর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।

৪) পঞ্চম শ্রেণী: ‘বিদায় হজ্জ’ নামক শেষ নবীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।

৫) পঞ্চম শ্রণী: বাদ দেওয়া হয়েছে কাজী কাদের নেওয়াজের লিখিত ‘শিক্ষা গুরুর মর্যাদা’ নামক একটি কবিতা। যা বাদশাহ আলমগীরের মহত্ত্ব উঠে এসেছে। এবং শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে আদব কেমন হওয়া উচিত তা বর্ণনা করা হয়েছিলো।

৬) পঞ্চম শ্রেণী: শহীদ তিতুমীর নামক একটি জীবন চরিত। এ প্রবন্ধটিতে শহীদ তিতুমীরের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ ছিলো।

৭) ষষ্ঠ শ্রেণী: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিত 'সততার পুরষ্কার' নামক একটি ধর্মীয় শিক্ষনীয় ঘটনা।

৮) ষষ্ঠ শ্রেণী: মুসলিম দেশ ভ্রমণ কাহিনী- 'নীলনদ আর পিরামিডের দেশ'।

৯) ষষ্ঠ শ্রেণী: মুসলিম সাহিত্যিক কায়কোবাদের লেখা 'প্রার্থনা' নামক কবিতাটি।

১০) সপ্তম শ্রেণী: বাদ দেওয়া হয়েছে মরু ভাস্কর নামক শেষ নবীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।

১১) অষ্টম শ্রেণী: বাদ দেওয়া হয়েছে 'বাবরের মহত্ত্ব' নামক কবিতাটি।

১২) নবম-দশম শ্রেণী: সর্ব প্রথম বাদ দেওয়া হয়েছে মধ্যযুগের বাংলা কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের লেখা 'বন্দনা' নামক ধর্মভিত্তিক কবিতাটি।

১৩) নবম-দশম শ্রেণী: এরপর বাদ দেওয়া হয়েছে মধ্যযুগের মুসলিম কবি 'আলাওল' এর ধর্মভিত্তিক 'হামদ' নামক কবিতাটি।

১৪) অষ্টম শ্রেণী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বেগম সুফিয়া কামালের লেখা "প্রার্থনা" কবিতা।

১৫) নবম-দশম শ্রেণী: বাদ দেওয়া হয়েছে মধ্যযুগের মুসলিম কবি আব্দুল হাকিমের লেখা 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি।

১৬) নবম-দশম শ্রেণী: জীবন বিনিময় কবিতাটি। কবিতাটি মোঘল বাদশাহ বাবর ও তার পুত্র হুমায়ুনকে নিয়ে লেখা।

১৭) নবম-দশম শ্রেণী: কাজী নজরুল ইসলামের লেখা বিখ্যাত 'উমর ফারুক' কবিতা।

এর বদলে বাংলা বইয়ে প্রবেশ করেছে-

১) পঞ্চম শ্রেণী: স্বঘোষিত নাস্তিক হুমায়ুন আজাদ লিখিত 'বই' নামক একটি কবিতা, যা মূলত মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ কোরআন বিরোধী কবিতা।

২) ষষ্ঠ শ্রেণী: প্রবেশ করানো হয়েছে 'বাংলাদেশের হৃদয়' নামক একটি কবিতা। যেখানে রয়েছে হিন্দুদের দেবী দূর্গার প্রশংসা।

৩) ষষ্ঠ শ্রেণী: সংযুক্ত হয়েছে 'লাল গরুটা' নামক একটি ছোটগল্প। যা দিয়ে মুসলিম শিক্ষার্থীদের শেখানো হচ্ছে গরু হচ্ছে মায়ের মত, অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদ।

৪) ষষ্ঠ শ্রেণী: অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ভারতের হিন্দুদের তীর্থস্থান রাঁচি'র ভ্রমণ কাহিনী।

৫) সপ্তম শ্রেণী: 'লালু' নামক গল্পে বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে পাঁঠাবলির নিয়ম কানুন।

৬) অষ্টম শ্রেণী: পড়ানো হচ্ছে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ ‘রামায়ণ’ এর সংক্ষিপ্তরূপ।

৭) নবম-দশম শ্রেণী: প্রবেশে করেছে ‘আমার সন্তান’ নামক একটি কবিতা। কবিতাটি হিন্দুদের ধর্ম সম্পর্কিত ‘মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত, যা দেবী অন্নপূর্ণার প্রশংসা ও তার কাছে প্রার্থনাসূচক কবিতা।

৮) নবম-দশম শ্রেণী: অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ভারতের পর্যটন স্পট ‘পালমৌ’ এর ভ্রমণ কাহিনী।

৯) নবম-দশম শ্রেণী: পড়ানো হচ্ছে ‘সময় গেলে সাধন হবে না’ শিরোনামে বাউলদের বিকৃত যৌনাচার।

১০) নবম-দশম শ্রেণী: ‘সাকোটা দুলছে’ শিরোনামের কবিতা দিয়ে ‘৪৭ এর দেশভাগকে হেয় করা হচ্ছে, যা দিয়ে কৌশলে ‘দুই বাংলা এক করে দেওয়া’ অর্থাৎ বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

১১) প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয় গুলোতে দেওয়া হয়েছে (নিজেকে জানুন) নামক যৌন শিক্ষার বই।

১২) নবম-দশম শ্রেণী: প্রবেশ করেছে ‘সুখের লাগিয়া’ নামক একটি কবিতা, যা হিন্দুদের রাধা-কৃষ্ণের লীলাকৃর্তণ (!)।

(http://kolkata24x7.com/hinduism-controversy-in-school-syllabus.html)

বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ করছি। এই পুরো আলোচনাগুলিই মূলত একটা স্পষ্ট বার্তা বহণ করে। যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে তা কেবল নিকট অতীত থেকে, এবং যা সবার সামনে ঘটেছে। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে মুসলিমদের ওপর দিয়ে যে প্রহসন ও নিগ্রহ গত হয়েছে এবং হচ্ছে তার কোন সীমা পরিসীমা নেই। তাছাড়া ভারতের উগ্র হিন্দুদের দ্বারা প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত করা মুসলিমদের কথা আমরা এখানে আনিনি। আনিনি ভারতের অলিতেগলিতে গরুর মাংস খাওয়া কিংবা মুসলিম মেয়ে হিসেবে যে পরিমাণ নির্যাতন, হত্যা আর ধর্ষণ হয়েছে। কাশ্মিরের রক্তভেজা আখ্যানও আমরা বর্ণনা করিনি! আমরা এখানে বর্ণনা করিনি ফুলাত, মুজাফফরনগর, সাহারানপুর, গুজরাট ও হায়দারাবাদে যে গণহত্যা চলেছিল মুসলিমদের ওপর। আমরা বলিনি ঐ সমস্ত দাঙ্গায় সর্বনিম্ন নিহতের সংখ্যা ছিল দশ হাজার, আর সর্বোচ্চ লাখও অতিক্রম করেছিল। ধর্ষণ, লুটপাট আর বাড়িঘর ভাঙচুরের ফিরিস্তি তো আছেই! আমরা বাংলাদেশে কিভাবে ইসলাম নিয়ে আছি সে ব্যাপারে অতি কিছু বলার সাহস পাইনি! ৫-ই মে আমাদের সাথে কি ঘটেছিল? কতটা অসহায় আমরা! আমাদেরই সরকার, আমাদেরই ভাই, আমাদেরই বাহিনী

ইসলামের দাবিতে রাজপথে থাকা নিরস্ত্র আবেগী আপামরের ওপর কিভাবে ঝাপিয়ে পড়ে রক্ত খেলায় মেতে ওঠেছিল তাও উল্লেখ করিনি! আমাদের রক্তের যে মূল্য নেই এবং এই রক্ত যে একদিন পথেঘাটে অসহায়ভাবে প্রবাহিত হবে তা আমাদেরকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে!

উপমহাদেশের অপর দুই দেশের মাঝে শ্রীলঙ্কার আলোচনা সামান্য হয়েছে। এবং মায়ানমার নিয়ে তো অবশ্যই কিছু বলার প্রয়োজন নেই! তারা ইতিমধ্যে আশঙ্কাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে স্বর্গে গিয়ে ঢেঁকুর তুলছে।

তাহলে এখন আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে গাজওয়াতুল হিন্দের যুদ্ধাবস্থা বিশ্লেষণ-

একদিকে পাকিস্তান,

অন্যদিকে ভারত-মায়ানমার-বাংলাদেশের ত্বগুত সরকার ও সেনাবাহিনীর মিত্র জোট

অপর প্রান্তে জিহাদের চেতনায় হাজির হবে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের সমস্ত তাওহীদপন্থী মুসলিম মুজাহিদীনরা। যারা দেশ-সীমানা পেরিয়ে আল্লাহর দ্বীনের পতাকাতলে সমবেত হবে। তারা সকল দেশের, সকল মানুষের থেকে একই দলের, একই পথের সৈনিক হবে। সবাই করবে যুদ্ধ আর তারা করবে জিহাদ। এরাই হিন্দের মুজাহিদীন। এরাই যুদ্ধের শেষে বিজয়ী হবে ইনশা আল্লাহ!

আমাদের এতটুকু আলোচনায় আপনি যদি কিছুটা হলেও উপমহাদেশের প্রেক্ষাপট বুঝতে সক্ষম হন **আসুন পুরো যুদ্ধটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংক্ষেপে একটু বিশ্লেষণ করে নেই...!**

হিন্দের যুদ্ধাবস্থা বিশ্লেষণ

যে কেউ এই যুদ্ধটি শুরু করবে, তা সবার যুদ্ধ হয়ে ওঠবে। সবখানে ছড়িয়ে পড়বে! মূলত এই যুদ্ধ নিয়ে কেউই রক্ষণাত্মক ভূমিকায় নেই। সবাই যুদ্ধাবস্থায় প্রস্তুত আছে। যে কোন ভাবেই যে কেউ এই যুদ্ধটির সূত্রপাত করবে। মূলত কেউ নিজেদের লক্ষ্য আদায়ে বিলম্ব করতে চাইবেনা। আরাকানের কথাই ধরুন! একটি জাতিকে নির্মূল করে দেওয়া হল। ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা চালানো হলো। নারীদের ধর্ষণ করা হলো! শরণার্থী ক্যাম্পে গেলে হাজার হাজার শিশু পাওয়া যায় যারা অদ্যকার পাশবিকতায় পিতা হারিয়েছে। লাখো নারী যারা বিধবা হয়েছে!

আচ্ছা, গাজওয়াতুল হিন্দের কঠোরতা কি আরাকানের ওপর চেপে বসেনি! তাদের জন্যে কি কিয়ামত হয়ে যায়নি? অনন্তর যে কোন হিলা-বাহানায় সবখানেই এভাবে মুসলিমদের বিনাশ করার অপচেষ্টা চলবে! কাশ্মির, আসাম, কর্ণাটক, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ। হয়তো কোন একটি চালে গণ্ডগোল হয়ে যাবে আর সবকিছুই এলোমেলো হয়ে যাবে। শুরু হবে গাজওয়াতুল হিন্দ। কেননা কেউই এখানে পরাস্ত হতে আসবেনা! সবাই জানে এখন টিকে গেলে টিকবে নয়তো ধূলিসাৎ হয়ে যেতে হবে! ভারতীয় উগ্র হিন্দুরা যুদ্ধটিকে তড়িৎ বাঁধাতে চেষ্টা করে যাচ্ছে! নিচে একটি খবর দিচ্ছি যা আপনাকে বিস্মিত করবে-

"আসামের নালবাড়ি জেলায় আইএস এর পতাকা গাছে বেঁধে মুসলিমদের ওপর দোষ চাপাতে গিয়ে ধরা পড়ে ৬ বিজেপি কর্মী। খবরটি ১০ মে ২০১৮ সংবাদপত্র ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে সৃষ্টি হয় নানা সমালোচনা, উৎকণ্ঠা!"

চিত্রঃ ক্ষমতাসীন দল বিজেপির কর্মীদের গাছের সঙ্গে সাঁটানো আইএস এর পতাকা

এমন ঘটনা অসংখ্য! যুদ্ধটা সচেতন! একটি উল্কাপিন্ড অপেক্ষা করছে হিন্দের জন্যে! আর আমরা অস্থির হয়ে আছি আরাকানের মতোই আরেকটা ম্যাসাকারের আশঙ্কায়! দুনিয়াতে এখন আর কোন মুসলিম দেশই আক্রান্ত হওয়া থেকে মুক্ত নয়। ইরাক, আফগান, ফিলিস্তিন, সিরায়া, লিবিয়া, লেবানন, মিশর, ইয়েমেন, তিউনিসিয়া, সোমালিয়া, ককেশাস, বসনিয়া, চেচনীয়া, তুর্কীস্থান, কাশ্মির, আরাকানসহ তাবৎ মুসলিমদেশগুলিতে হত্যা ও পাশবিকতার খেলা শুরু হয়ে গেছে কবেই! শুধু বাকি আছি আমরা! আরাকান থেকেই অনুমিত হয় কি পরিমাণ ধ্বংস ও পাশবিকতা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে! একটু উহঃ শব্দ আর একটি বুলেটেরও প্রতিরোধ ছাড়াই আরাকানকে দাফন করে দেওয়া হল! হায়! আরাকানিরা তো আশ্রয় নিয়েছে বাংলাদেশে, কত নির্মমতা, বাংলাদেশিরা কোথায় আশ্রয় নিবে? প্রতিরোধ, মৃত্যু অথবা বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর যে কোন আশ্রয় নেই, গত্যন্তর নেই! বাংলাদেশের ওপর যে ম্যাসাকারটি হবে- এ ব্যাপারে ক্বাসীদায়ে শাহ নেয়ামতুল্লায় এসেছে-

"ধ্বংস নিহত হবে মুসলিম বিধর্মীদের হাতে

হবে নাজেহাল, ছেড়ে যাবে দেশ ভাসিবে রক্তপাতে

(৩৬)

মুসলমানের জান-মাল হবে খেলনা- মুল্যহত

রক্ত তাদের প্রবাহিত হবে সাগর স্রোতের মত

(৩৭)

এরপর যাবে ভেগে নারকীরা পাঞ্জাব কেন্দ্রের

ধন সম্পদ আসিবে তাদের দখলে মুমিনদের

(৩৮)

অনুরূপ হবে পতন একটি শহর মুমিনদের

তাহাদের ধনসম্পদ যাবে দখলে হিন্দুদের

(৩৯)

হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ সেখানে চালাইবে তারা ভারি

ঘরে ঘরে হবে ঘোর কারবালা ক্রন্দন আহাজারি

(৪০)

মুসলিম নেতা- অথচ বন্ধু কাফেরের তলে তলে

মদদ করিবে অরি কে সে এক পাপ চুক্তির ছলে

(৪১)

প্রথম অক্ষরে থাকিবে শীনে'র অবস্থান

শেষের অক্ষরে থাকিবে নূন' ও বিরাজমান

ঘটিবে তখন এসব ঘটনা মাঝখানে দু'ঈদের

ধিক্কার দিবে বিশ্বের লোক জালিম হিন্দুদের

সমূহ সম্ভাবনা এও হতে পারে, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সর্বপ্রথম যুদ্ধের সূচনা হবে এবং তা সামগ্রিক রূপ লাভ করবে। উভয়টিই শক্তিধর রাষ্ট্র এবং তাদের সাথে রয়েছে বৈশ্বিক মোড়লদের কিছু জারজ রাষ্ট্র, তারাও এতে অংশ নিবে অর্থ, অস্ত্র, কূটনীতি ও স্বার্থ-সামর্থ্য সব কিছু দিয়েই। এর প্রভাব পড়বে পুরো উপমহাদেশে। পূর্ব পট অনুযায়ী ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় শুধু পাকিস্তানকেই শত্রু জ্ঞান করবেনা বরং উপমহাদেশের সমস্ত মুসলিমদের প্রতিই তাদের বিষবাষ্প নিক্ষেপ করবে। বিপাকে পড়বে ভারতের মুসলিম নাগরিকেরা। মানবিক বিপর্যয় প্রকট হয়ে ওঠবে। ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিমদের দুর্দশা সারা দুনিয়ার মুসলিমদের প্রভাবিত করবে।

অপরদিকে আজাদি আন্দোলনের কাশ্মির মাথা নাড়া দিয়ে ওঠবে। সন্দেহাতীতভাবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। যুদ্ধটা তখন দাঁড়িয়ে যাবে ভারতের সাথে পাকিস্তান রাষ্ট্র ও ভারতের মুসলিমদের যুদ্ধ। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ কাশ্মির ও নিজ দেশকে সমর্থন দিবে যার প্রভাব আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশেও পড়বে। আজকের সিরিয়া-গুতার মতো নির্মমতা মানবিক বিপর্যয় সবাইকে একবারের জন্যে হলেও শিহরিত করে দিয়ে যাবে।

ভারতের চাপে ও চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ ভারতকে যুদ্ধে সহায়তা দিবে। বাংলাদেশের আপামর তাওহিদী জনতা তা মেনে নিবেনা এবং ভারত বিরোধী যুদ্ধে তারা অংশ নিবে বাহ্যত যা পাকিস্তানের পক্ষেই ধরা হবে। শুরু হবে বাংলাদেশ সরকারের সাথে জনতার বিরোধ। বাংলাদেশেরই আপামরের সন্তান পুলিশ-সেনাবাহিনী সরকারের নির্দেশে মুখোমুখি হবে নিজ দেশের তাওহিদী জনতার। নিজেরা নিজেদের দ্বারা ধ্বংস হওয়ার এক সমীকরণ পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তুলবে। যেমন ভাবে আজকের দিনে আফগানিস্তানে আফগান সেনাবাহিনী আমেরিকার নির্দেশ ও হুকুমে হত্যা করছে আফগানদের, পাকিস্তান সেনাবাহিনী সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের নামে হত্যা করছে সোয়াত-ওয়াজিরিস্থানের মুসলিমদের, সিরিয়াতে রাশিয়ার সাথে মিলে লাখে লাখে হত্যা করছে সিরিয়ান মুসলিমদের সিরিয়ারই সরকার।

এদিকে পাকিস্তান বিস্তৃত শত্রু নিয়ন্ত্রিত ভূমিতে (বাংলাদেশেও) হামলা চালাবে। ভারতও ব্যতিক্রম হবেনা। মূলত উভয়েই নিজেদের সর্বোচ্চ আক্রমন চালাবে। বেঘোরে মারা পরবে ভারতের হিন্দুরা আর পাকিস্তানের মুসলিমরা।

এমতাবস্থায় সম্ভবত বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতিকূলে যাবে পরিস্থিতি। বিরুদ্ধবাদী তাওহিদী জনতা, মুজাহিদীন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, পাকিস্তানের আশু হস্তক্ষেপ ইত্যাদি কারণে।

তাই নিজের ক্ষমতা ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে নিয়মতান্ত্রিকভাবেই ভারতের দ্বারস্থ হতে হবে। ভারত কঠোর হস্তে দমন করতে চাইবে বাংলাদেশকে। যা অনেকটা হবে ভোগ-দখল ও অখন্ড ভারত গঠনের চেতনা নিয়েই। এটিই সম্ভবত নিয়ামতুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন-

অনুরূপ হবে পতন একটি শহর মুমিনদের

তাহাদের ধনসম্পদ যাবে দখলে হিন্দুদের

হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ সেখানে চালাইবে তারা ভারি

ঘরে ঘরে হবে ঘোর কারবালা ক্রন্দন আহাজারি (৩৮ ও ৩৯ নাম্বার শ্লোক)

ভারতের সাথে যোগ দিবে মায়ানমারও। **১০** লক্ষ রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দাতা বাংলাদেশ মায়ানমারের সাথে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিরোধকে তুঙ্গে নিয়ে যাবে। ভারত হিমশিম খাবে বাংলা-বার্মাকে সামলাতে।

ভারত নতুন সমস্যায় আক্রান্ত হবে। ভারতের অভ্যন্তরীণ ২৫ কোটি মুসলিমরা ভারতীয় সেনাদের জন্যে নিজেদের ভূখন্ডকেই কবরস্থান রচনা করবে। বিশেষত যারা জিহাদি চেতনায় লালায়িত।

ভারত-বাংলা-বার্মা আর পরাশক্তিদের মিত্রজোট মিলে সম্মিলিত আক্রমন রচনা করবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। এন্টি ভারত মুসলিমদের সামলাতে বাংলাদেশেও চলবে ক্রেকডাউন, গণহত্যা।

এভাবেই ধীরে ধীরে ভারত-পাকিস্তানের প্রতিহিংসা আর প্রতিপত্তির যুদ্ধটি রূপ নিবে হিন্দু বনাম মুসলিমদের যুদ্ধে।

পাকিস্তান সুযোগটিকে কাজে লাগাবে। এটিই হবে গাজওয়াতুল হিন্দে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। তারা এই যুদ্ধকে **হিন্দু বনাম মুসলিমের যুদ্ধ** বলে প্রচার চালাবে। চারদিকের বাস্তবতা তাদের এই প্রচারে হাওয়া দিবে। জমে ওঠবে হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ। দেশ-সীমানা পেরিয়ে ক্রমেই যুদ্ধটি ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করবে এবং হিন্দু মুসলিমরা আলাদা তাবুতে চূড়ান্ত বিভক্ত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে! কাশ্মির, আসাম, হায়দ্রাবাদ, বাংলাদেশের নিপীড়িত মুসলিমদের প্রতিরোধযুদ্ধ না চাইতেও পাকিস্তানের পক্ষে চলে যাবে। হিন্দুশক্তির বিরুদ্ধে তখন সকল মুসলিমদের যুদ্ধ অভিন্ন জিহাদে রূপ নিবে। পাকিস্তান এর ফসলকে ঘরে নিতে কমতি করবেনা। সুতরাং এই যুদ্ধটি অনেক বেশি দীর্ঘ না হলেও খুব একটি সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ হবে না। এবং যুদ্ধের এই পর্যায়েই মূলত গাজওয়াতুল হিন্দ যেটাকে চূড়ান্ত যুদ্ধ বোঝানো হয়েছে সেটি শুরু হবে।

যুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার কঠোরতা। বিভীষিকা অভাব দুর্ভিক্ষ আর একটি দীর্ঘ যুদ্ধের ক্রমান্বয়ে বাড়ন্ত মৃত্যুর মিছিল যে কোন শক্তিশালী পালোয়ান অথবা একটি সুগঠিত দল যাই হোক না কেন তাকে টলিয়ে দিতে পারে। যাদের রয়েছে দুনিয়ার লোভ অর্থলিপ্সা নীতি-নৈতিকতার অভাব, সঠিক আদর্শের ঘাটতি এবং মৃত্যুর ভয়, তারা কখনোই নিজেদের আদর্শ কিংবা চেতনা দিয়ে যুদ্ধে অটল

থাকতে পারেনা। এই সমস্ত নিকৃষ্ট যুদ্ধবাজ মানুষ বা দলগুলি- আপনি যুদ্ধের ময়দানে তাদের দেখবেন যুদ্ধ অথবা বিজয় অথবা আদর্শ যেকোনো কিছু থেকেই তারা নিজেদের উদরপূর্তি অথবা দুনিয়াবী চাহিদা, হত্যা, লুণ্ঠন, জুলুম, ভোগদখল করতেই তাদের মনোনিবেশ বেশি। যুদ্ধ তাদের নিকট অন্য দশটি সাধারণ ব্যবসার মতোই একটি ব্যবসা। কপটতা, ছলনা, প্রতারণা, হত্যা, লুণ্ঠন, রক্তপাত এগুলি হল তাদের ব্যবসার মূলধন।

সুতরাং এমন একটি বিস্তৃত যুদ্ধ যেখানে আপনি অধিকাংশকেই পাবেন অস্থির এবং সংশয়গ্রস্ত। মূলত তারা নিজেদের আদর্শ অথবা কেন যুদ্ধ করছে এসব কিছু থেকেই গাফেল। প্রভুদের গোলামি অথবা নিজেদের উদরপূর্তি, চাকুরী বা হীন স্বার্থের জন্যই তারা যুদ্ধ করে থাকে। তাই আপনি এ ধরনের যুদ্ধগুলিতে দেখবেন অধিকাংশ দলগুলি ক্রমাগত নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করে। সিরিয়ার যুদ্ধ যার উৎকৃষ্ট নমুনা। উম্মাহ এখান থেকে তার যথেষ্ট পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে। আজ যাদের সাথে বন্ধুত্ব কাল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করে এবং পরশু পুনরায় তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। সুতরাং এই ইতর শ্রেণী কিভাবে একটি ভয়ঙ্কর ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে অটল অবিচল থাকতে পারে?

একমাত্র তারাই এসব যুদ্ধে অটল অবিচল থাকে যাদের রয়েছে একটি সুগভীর আদর্শ, নীতি-নৈতিকতার এক উত্তম উপাখ্যান এবং পার্থিবতার গণ্ডি পেরিয়ে এক পরলৌকিক জীবনের হাতছানি। তাওহীদ ও একত্ববাদে বিশ্বাসী, যারা বিশ্বাসী ঈমানের বলে বলিয়ান এবং জিহাদি চেতনায় শাণিত। আল্লাহর পথে আগত সমস্ত বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-কষ্ট যারা নিবেদিত থেকে সহ্য করে। যাদের রয়েছে তার প্রভুর কাছে উত্তম প্রতিদানের প্রত্যাশা। যারা নিজেদের রক্ত মাংস অর্থ আল্লাহর দ্বীনের জন্য উৎস্বর্গ করে। যুদ্ধের কঠোরতা তাদের আরো বেশি শক্তিশালী করে। তাদের মনোবল বৃদ্ধি করে এবং তাদের রবের প্রতি আরো বেশি অবনত করে। তারা তাদের রবের প্রতি আরো বেশি মুখাপেক্ষী হয়। তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়।

অনন্তর যারা গাজওয়াতুল হিন্দে নানামতে, নানাপথে থেকে অংশগ্রহণ করবে তাদের মধ্য থেকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শকে সামনে রেখে অটল-অবিচল হয়ে সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় একমাত্র মুজাহিদীনরা লড়াই করবে। সমস্ত মুসলিমদের মনের আশা-আকাংখা একমাত্র তাদের দ্বারাই প্রতিফলিত হবে। দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা একমাত্র এই মুজাহিদীনদের দ্বারাই নির্বাপিত হবে। এভাবেই ক্রমাগত অবস্থান পরিবর্তনকারী সব ধরনের দল-মতের এই দ্বিচারিতা দেখে সর্বসাধারণ মুসলমানরা মুজাহিদীনদের দিকে ঝুঁকে যাবে।

---

[1]. সিরিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন জসীমউদ্দীন আহমাদের "সিরিয়া মহাযুদ্ধের কাল"

সত্যিকার অর্থেই যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য, আল্লাহর তাওহীদের জন্য, আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। যারা নিজেদের কথার সত্যতা নিজেদের রক্তকে প্রবাহিত করে রক্ষা করবে। যেকোনো ধরনের দুনিয়াবী স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে কেবল ঐ আখেরাতকে সামনে রেখে তারা লড়াই অব্যাহত রাখবে। মূলত এই সমস্ত মুজাহিদীনরা তো হচ্ছে তারা যারা ওলামায়েকেরাম, যারা এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং যারা এই উম্মাহর মধ্যে, মানুষদের মধ্য থেকে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি- আল মু'মিনুন। এভাবেই আগত সময়ের প্রেক্ষাপটে যুদ্ধের কলকাঠি মুজাহিদীনদের হাতে যাবে এবং জনস্রোত মুজাহিদীনদের পক্ষে যাবে। ক্রমেই এই যুদ্ধ হয়ে উঠবে তাওহীদ ও শিরকের যুদ্ধ এবং সর্বশেষ তাওহীদ ইনশাআল্লাহ শির্কের উপর বিজয়ী হবে। বিজয়ী হবে হিন্দুত্ববাদের উপর ইসলাম এবং সনাতনী হিন্দুদের উপর মুসলিমরা।

ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনাটির সাথে সম্পর্ক রাখে নিকট অতীত থেকে আমরা এমন একটি উদাহরণ নিতে পারি। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে আক্রমণ করলে শুরু হল মুসলিম জাহানের প্রতিরোধ যুদ্ধ। সারা দুনিয়া থেকে উম্মাহর সন্তানরা জিহাদের জন্য, মুসলিম ভূমি আফগানিস্তানকে রক্ষার জন্য আফগানের ময়দানে হিজরত করে। যাদের চেতনা ছিল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। যারা বাস্তব অর্থে আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্যই হিজরত করেছিল। মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগান যুদ্ধ ছিল এক সম্মিলিত প্রতিরোধ যুদ্ধ যেখানে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ রাষ্ট্রই তাদের প্রতিরোধ যুদ্ধে সমর্থন করেছিল। এমনকি আমেরিকাও। সব ধরনের মানুষই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। একজন ভালো ধার্মিক, একজন সাধারন মুসলিমও। তাদের কতক এমন ছিল যারা নিজেদের বংশ বা গোত্রের জন্য যুদ্ধ করেছিল, তাদের কতক এমন ছিল যারা দেশ প্রেমের জন্য যুদ্ধ করেছিল, তাদের কতক জাতীয়তাবাদের জন্য যুদ্ধ করেছিল। আবার এমনও ছিল যারা নিজেদের স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করেছিল। সুতরাং বিভিন্ন মত, চিন্তা সম্বলিত মানুষগুলির প্রতিরোধ যুদ্ধের পর যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটল, আফগানিস্তান বিজয়ী হল এবং স্বাধীন হলো- তখন কে নেবে আফগানিস্তানের শাসনভার এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য হল। যারা শিয়া ধর্মাবলম্বী ছিল তারা একটি শিয়া আফগান রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখল। যারা গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ এর জন্য লড়াই করেছিল তারা একটি গণতান্ত্রিক আফগানিস্তানের জন্য নিজেদেরকে আফগানের শাসক দাবী করলো। এবং যারা বংশ কিংবা গোত্রের জন্য লড়াই করেছিল তারা একটি স্বাধীন বংশ বা গোত্র হিসেবে নিজেদেরকে পেতে পছন্দ করল। আর যে সমস্ত নেককার সন্তানেরা আল্লাহর দ্বীনের জন্য, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য লড়াই করেছিল তারা আফগানিস্তানকে একটি ইসলামিক ভূখণ্ড যা আল্লাহর শরিয়া দ্বারা শাসিত হয়– এমন একটি ইসলামিক ইমারা হিসেবে আফগানিস্তানকে চাইল। এটি ছিল সত্যিকার অর্থেই একটি আদর্শিক সংঘর্ষ। সেখানে কেউই নিজেদের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিল না। এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে একটি দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পুনরায় আফগানিস্তান আবারো গৃহযুদ্ধের

মুখোমুখি হলো। খুবই ভয়াবহ ব্যাপার। মাত্র কিছুদিন আগেই যারা এক সাথে কাঁধেকাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে আজ তারাই পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছে।

আল্লাহর ইচ্ছা, যারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্যে, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য লড়াই করেছিল তাদেরকে আল্লাহ আফগানিস্তানে বিজয় দান করলেন এবং তারাই আফগানিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করলেন। আর এটি হয়েছিল মোল্লা মুহাম্মদ ওমর (রাহিমাহুল্লাহ্) এর দ্বারা যিনি তালেবান আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

আমরা সমগ্র গাজওয়াতুল হিন্দের শেষ দিকের ঘটনাগুলিকে এভাবেই কল্পনা করতে পারি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তা-চেতনা ও আদর্শের জন্য লড়াই করবে। কিন্তু শেষ দিকে প্রত্যেকের চিন্তা চেতনা ও আদর্শের উপরে মুজাহিদীনদের চিন্তা চেতনা ও আদর্শ, তাদের সততা, মহিমা এবং সত্যবাদিতা নিয়ে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আস্থার কারণে তারা সবার উপরে বিজয়ী হবে। ধ্বংস হয়ে যাবে **পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদ** এর আত্মম্ভরিতা ও অহংকার। মিশে যাবে তাদের জাতীয়তাবাদের গর্ব। তাওহীদ ও জিহাদের প্রবল স্রোতে গড্ডালিকা প্রবাহে হারিয়ে যাবে এক অভিশপ্ত জাতীয়তাবাদ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। উন্মোচিত হবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধোঁকা ও নিকৃষ্টতা। জনগণ হবে সত্যিকারের মুসলিম এবং তারা মুজাহিদীনদেরকে নিজেদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে। বিইজনিল্লাহ্!

ধ্বংস হয়ে যাবে মুজাহিদীনদের হাতে ভারত। ধ্বংস হয়ে যাবে তাদের নিকৃষ্ট হিন্দুত্ববাদ। গো-পূজা আর প্রতিমাপূজা-গঙ্গার স্রোতে ভেসে যাবে এসব নোংরা মতবাদ। কেবল রক্ত, কেবল রক্ত দিয়েই হিন্দুস্তানের ভূমিকে পবিত্র করা হবে। যে রক্তপাত হবে কালিমার নামে এবং যে রক্ত দিয়ে বুলন্দ করা হবে শুধু আল্লাহর কালিমাকেই। বিজয়ী হবে উপমহাদেশে ইসলাম। বন্দী করা হবে হিন্দুস্তানের মালাউন নেতাদের। বেড়ি পড়ানো হবে তাদের। অপমান আর লাঞ্ছনার শেকল।

এবং এই সময় গুলিতে সিরিয়া কেন্দ্রিক মালহামা-মহাযুদ্ধ বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হতে পারে সেটিও চলবে। এবং সেই মহাযুদ্ধ-সিরিয়াযুদ্ধ যেটি আজকের এই সময়ে চলমান রয়েছে এবং এটি ২০১২ সাল থেকে শুরু হয়েছে। আজকে সারা দুনিয়াব্যাপী যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ময়দান হচ্ছে বিলাদ আশ শাম। সিরিয়ার ময়দান হচ্ছে আজকের মুসলিম এবং ইসলামের জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর একটি ভূখণ্ড এবং একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ এবং সবচেয়ে সুতীব্র এক লড়াই।

সিরিয়া পরিস্থিতি; আমাদের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

সিরিয়ায় মুসলমানদের ওপর গত ৬ বছর ধরে অত্যাচার চলছে। এ যেন মুসলমান মারার মহোৎসব। এখানে লক্ষ্য একটাই। হাদীসে বর্ণিত মহানবী (সা.) এর সিরিয়া, দামেস্ক, গোতা, ইমাম মাহদী, দাজ্জাল, হযরত ইসা (আ.) ইত্যাদি সম্পর্কিত সকল ভবিষ্যদ্বাণীর নির্দিষ্ট রক্ত, বংশ, স্থান ও স্থাপনাগুলো তছনছ করে দেওয়া। যেন আল্লাহর নির্দিষ্ট পরিকল্পনা (নাঊযুবিল্লাহ্) উলটপালট করে দেওয়া যায়। মহানবী (সা.) এর আধ্যাত্মিক ছক এলোমেলো করে দেওয়া যায়। এমনিভাবে, শাহ নেয়ামতুল্লাহ (রহ.) তার আধ্যাত্মিক ক্বাসিদায় দু'টি লাইন এমন বলেছেন,

'একসময় ভারতকে ঘিরে ধরবে আফগানিস্তান ও চীন। সাথে থাকবে খোরাসান।'

সবচেয়ে বড় কথা হল একদিকে নানা আঙ্গিকে হাদীসে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে যাচ্ছে। অপরদিকে দাজ্জাল বা ধোঁকা-প্রতারণার বাজার এত গরম যে, শয়তানও অবাক। ভাবছে, আমার চেলারা তো আমার চেয়ে অগ্রসর হয়ে গেছে। তিরমিযি শরীফের বর্ণনায় আছে, **'যখন শামে কোনো কল্যাণ থাকবে না, ফাসাদ সৃষ্টিকারী খারাপ লোকদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তোমাদের মধ্যেও কল্যাণ থাকবে না।'**

অচিরেই তোমাদের জন্য শাম বিজিত হবে, তাতে একটি জায়গা রয়েছে, যাকে গোতা বলা হয়, এই জায়গাটি হবে যুদ্ধের সময় মুসলমানদের উত্তম ঠিকানা (ঘাঁটি)।'

বিগত ছয় বছর ধরে সিরিয়ায় যে জুলুম চলছে তার কোনো উপমা নিকট ইতিহাসে মেলে না। এই ছয় বছরের মধ্যে রয়েছে- বর্তমানে বিনা কারণে এবং নতুন কোনো কারণ ছাড়াই গোতাতে নির্বিচারে বোমাবর্ষণের ঘটনা। সুতরাং ঈমান থাকলে যার যেভাবে সম্ভব খেদমত করুক, নতুবা নিজের সম্পদ আঁকড়ে পড়ে থাকুক। আজ এই মজলুমদের কাজে না এলে, সেদিন তা দিয়ে কী লাভ হবে যেদিন এ সম্পদ কারও কাজের থাকবে না?

মজলুম সিরিয়দের সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহযোগী হওয়া উচিত আরব বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের। কারণ গাজওয়ায়ে শাম (শামের যুদ্ধ) ও গাজওয়ায়ে হিন্দ (হিন্দুস্তানের যুদ্ধ) হবে দুনিয়ার বড় দুটি যুদ্ধ। **গাজওয়ায়ে শাম ইহুদীদের বিরুদ্ধে এবং গাওয়ায়ে হিন্দ ইহুদীদের ঐতিহাসিক মিত্র মুশরিকদের বিরুদ্ধে হবে**। যতদিন এই দুটি মহাযুদ্ধের মাধ্যমে দুনিয়ায় মহান ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা না হবে। আর যতদিন বিশ্বব্যাপী নবুওয়াতী ধারার বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন কেয়ামত আসবে না।

আবু লুবাবা আরো বলেন, "গাজওয়ায়ে হিন্দে বিজয়ী হবে এখানের নেককার লোকেরা, উপমহাদেশের প্রায় ৭০ কোটি মুসলমানের মধ্যে কত ভাগ এই ঈমানী অভিযানে যোগ দিবে তা

আল্লাহই জানেন। তারপর এই বাহিনী গাজওয়ায়ে শামের বিজয়ীদের সাহায্যে এগিয়ে যাবে। যে মজলুমের সঙ্গে থাকবে তার জন্য সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। যে জালেমের সঙ্গ দিচ্ছে সে চির হতভাগা। যে না হাদিস থেকে শিক্ষা নেয়, না নিষ্পাপ শিশুদের রক্ত তার অন্তরকে বিগলিত করে!

এই সিরিয়ার যুদ্ধ তখন তার শেষ দিকে উপনীত হবে। ইমাম আল মাহদির নেতৃত্বে সারা দুনিয়ায় মহাযুদ্ধ পরিচালিত হবে। এই মহাযুদ্ধ শুধু ইসলামের সাথে কুফরের যুদ্ধই নয় বরং সমস্ত পরাশক্তিগুলো পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এবং এই মহাযুদ্ধের মহা দুর্যোগকালীন সময়ে দুনিয়ায় আবির্ভূত হবে মাসিহ দাজ্জাল। দুনিয়ার শুরু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ফিতনা। প্রত্যেক ফেরাউনের জন্যই আল্লাহ রেখেছেন একজন মুসা। তেমনি কানা দাজ্জালের জন্যও রয়েছে ঈসা ইবনে মারিয়াম ('আলাইহিস সালাম)।

ঈসা ('আলাইহিস সালাম) অবশেষে আকাশ থেকে দুনিয়াতে অবতরণ করবেন। এটি হবে দামেস্কের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের মিনারে অবতরণ। যখন তিনি দুই জন ফেরেস্তার কাঁধে ভর দিয়ে সেই মিনারে অবতরণ করবেন। তার পরনে থাকবে দুটি হলুদ রঙের চাদর। তার চুল থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়বে পানি।

তিনি এগিয়ে যাবেন দাজ্জাল কে হত্যা করতে। আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা তার দৃষ্টিশক্তি কে এমন করে দিবেন যে যতদূর যাবে দাজ্জাল তার দৃষ্টি সীমার মধ্যে পড়লেই এমনভাবে গলে যাবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। অন্যায় অশান্তি মূল হোতা দাজ্জাল ঈসা ('আলাইহিস সালাম) থেকে পলায়ন করবে। তার মিথ্যা প্রবল দাবি আর দুনিয়ার পালনকর্তা হওয়ার বিলাসিতা ছেড়ে সে নিজেকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠবে। কিন্তু আল্লাহ এই দাজ্জাল এর জন্য রেখেছেন তার অংশ। এবং ঈসা ('আলাইহিস সালাম) তাকে ধরে ফেলবেন। হত্যা করবেন।

এই ঘটনাগুলি যখন চলমান তখন হিন্দের দিকে কিন্তু মুজাহিদীনরা হিন্দ বিজয় করবে। তারা বেড়ি পরানো মালাউন নেতাদের নিয়ে সিরিয়াতে হিজরত করবে। কেননা সিরিয়ায় হবে তখন সারা দুনিয়ার মুসলমানদের কেন্দ্রীয় ফ্রন্ট, এটাই ইমাম মাহদীর ফ্রন্ট। এটাই ঈসা ('আলাইহিস সালাম) এর অবতরণস্থল।

এবং যখন হিন্দের মুজাহিদীনরা সিরিয়া গমন করবেন তারাও ঈসা ('আলাইহিস সালাম) কে পেয়ে যাবেন। সুবাহানাল্লাহ্! আল্লাহু আকবার!

আমার সম্মানিত প্রিয় পাঠক যেহেতু এটি গাজওয়াতুল হিন্দের আলোচনা সুতরাং আমরা এখানে ইমাম আল মাহদী, দাজ্জাল ও ঈসা ('আলাইহিস সালাম) এর আগমন ও আলামত নিয়ে সবিস্তরে কথা বলার প্রয়াস পাচ্ছি না। যেহেতু গাজওয়াতুল হিন্দের সাথে এই বিষয়গুলি সম্পর্কিত, তাই আগ্রহী পাঠকরা ইমাম মাহদী দাজ্জাল এবং ঈসা ('আলাইহিস সালাম) এর আগমন ও আলামত

নিয়ে পড়াশুনা করতে পারেন এবং এটি অবশ্যই জরুরি। এসংক্রান্ত যথেষ্ট কিতাবাদি বাংলা ভাষায় রয়েছে। [2] টীকায় আমরা কয়েকটি বইয়ের নাম উল্লেখ করে দিয়েছি। ইন্টারনেটে সার্চ দিয়েও আপনারা এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। হ্যা, ইমাম মাহদী, দাজ্জাল ও ফিতান নিয়ে কিছুটা হলেও পড়াশুনা করেছেন তারা জানেন আখেরুজ্জামান শুরু হয়েছে। আলামত প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা ক্রমেই চূড়ান্ত মুহূর্তের দিকে ধাবিত হচ্ছি। যে কোন দিন যে কোন সময় অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। আমরা শুধু আলোচিত কয়েকটি আলামত উল্লেখ করব যেগুলো আত্মাকে কাঁপিয়ে দেয়, লোমকে শিহরিত করে, জীবনকে থমকে দেয়! এগুলি জানান দেয়, ইমাম ও মাহদী দাজ্জাল এর আগমন কেবলই সময়ের ব্যাপার!

---

[2]. দাজ্জাল, মাহদী ও ঈসা আঃ নিয়ে কিছু কিতাবের নামঃ

ক) ইমাম মাহদীর আগমন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দাজ্জাল, (আসেম ওমর)

খ) ইমাম মাহদীর দোস্ত দুশমন (আসেম ওমর)

গ) সিরিয়া মহাযুদ্ধের কাল (জসীমউদ্দীন আহমাদ)

ঘ) মহা প্রলয় (ডঃ মুহাম্মাদ আঃ রহমান আরেফী)

এই সবগুলি বই-ই বাংলাভাষায় পাওয়া যায়

ইমাম মাহদী ও দাজ্জালের আগমন কি খুব নিকটে?

একটি হাদীসের বাস্তবায়নঃ

(আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী প্রতিটি মুমিনেরই এটা খুব মনোযোগ সহকারে পড়া উচিত।)

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সমগ্র বিশ্ব আজ অস্থির ও দিকভ্রান্ত। সকলের মাথায়ই কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে যে, ইমাম মাহদীর আগমন কি অত্যাসন্ন? খুব শীঘ্রই কি দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটতে যাচ্ছে? প্রশ্নটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এর প্রামাণ্য পর্যালোচনার। এককথায় উত্তর দিতে হলে বলবো, হ্যাঁ ভাই, খুবই অত্যাসন্ন, একেবারেই নিকটে; এতো নিকটে যে, গভীরভাবে একটু কান পাতলেই আমরা এর পদধ্বনি শুনতে পাবো।

বিষয়টি নিয়ে অনেকে কিছু লেখালেখি করলেও প্রামাণ্য হাদিস ও সঠিক তথ্যসূত্র সহকারে আলোচনা না করায় তা ঘোলাটে রূপ ধারণ করেছে। তাই এ বিষয়ে তথ্যবহুল এমন কিছু আলোচনা পেশ করার ইচ্ছা পোষণ করেছি, যদ্বারা আপনি বিস্ময়াভূত না হয়ে পারবেন না।

শুধু একটি হাদিস ও এর প্রেক্ষাপটে একটি ঘটনা শোনাবো আপনাদের।

ইমাম নুআঈম বিন হাম্মাদ রহ. (মৃত্যু: ২২৮ হি.) তাঁর 'আল ফিতান' গ্রন্থে বলেন:

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ تُبَيْعٍ، قَالَ: سَيَعُوذُ بِمَكَّةَ عَائِذٌ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِمْ، ثُمَّ يَعُوذُ عَائِذٌ آخَرُ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ فَلَا تَغْزُوَنَّهُ، فَإِنَّهُ جَيْشُ الْخَسْفِ

অর্থাৎ ***তুবাঈ রহ. বলেন, সত্ত্বরই মক্কায় এক আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় নিবে। অতঃপর তাকে হত্যা করা হবে। এরপর লোকেরা কিছুকাল অতিক্রান্ত করতে না করতেই দ্বিতীয় আরেকজন আশ্রয়প্রার্থী (মক্কায়) আশ্রয় নিবে। সুতরাং তুমি যদি তাঁর যুগ পাও তাহলে তাঁর বিরূদ্ধে যুদ্ধে যেও না। কেননা, তারা হবে ভূমিধ্বসে ধ্বংসপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী। (আল ফিতান, নুআঈম বিন হাম্মাদ: ১/৩২৭ হাদিস নং ৯৩৫)***

হাদিসটির বিশ্লেষণ: এটা প্রখ্যাত তাবেয়ী তুবাঈ বিন আমের হুমাইরী রহ. এর বর্ণিত হাদিস, যাকে হাদীসের পরিভাষায় হাদীসে মাকতূ' বলা হয়। রাসুল সা. এর যুগ পেলেও তিনি আবু বকর রাযি. এর খেলাফত আমলে ইসলাম গ্রহণ করেছেন । তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী কা'বে আহবার রহ. এর স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। তিনি আবু দারদা রাযি., কা'বে আহবার রহ. প্রমুখ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর থেকে আতা রহ., মুজাহিদ রহ. সহ বিখ্যাত তাবেয়ীগণ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি সাহাবীদের মাঝে খুবই গ্রহণযোগ্য ও বিজ্ঞ আলেম হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সর্বাধিক হাদিস

সংরক্ষণকারী আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাযি. এর মতো জলীলুল কদর সাহাবী পর্যন্ত তাকে শামের সবচে জ্ঞানী বলে সম্বোধন করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করতেন। (দেখুন, তাহযীবুল কামাল: ৪/৩১৬ জীবনী নং ৭৯৬) তাই এটা মাকতু' হাদিস হলেও যথেষ্ঠ মানসম্পন্ন ও শক্তিশালী একটি বর্ণনা।

এ হাদিসটির বর্ণনাকারীদের সবাই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হলেও শুধুমাত্র অলীদ বিন মুসলিম নামক একজন বর্ণনাকারী মুদাল্লিস হওয়ায় বর্ণনায় একটু দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনার দ্বারা এ দুর্বলতা অনেকটাই দূর হয়ে যায়। মুসলিম শরীফের বর্ণনাটি হলো:

فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ، وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ

অর্থাৎ উম্মে সালামা রাযি. বলেন, নবী করীম সা. বলেছেন, কাবা ঘরের পাশে একজন লোক আশ্রয় নিবে। তাঁর বিরুদ্ধে একদল সৈনিক প্রেরণ করা হবে। সৈন্যরা যখন বায়দা নামক স্থানে পৌঁছবে তখন তাদেরকে নিয়ে যমিন ধ্বসে যাবে। উম্মে সালামা রাযি. বলেন, আমি রাসূল সা. - কে জিজ্ঞেস করলাম, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে যারা তাদের সাথে যাবে তাদের কী অবস্থা হবে? উত্তরে নবী করীম সা. বললেন, তাকে সহ যমিন ধ্বসে যাবে। তবে কিয়ামতের দিন সে আপন নিয়তের উপরে পুনরুত্থিত হবে। (সহীহ মুসলিম: ৪/২২০৮, হাদিস নং ২৮৮২) তাই সর্বদিক বিবেচনায় উপরোক্ত হাদিসটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের বলা যায়।

হাদিসটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে বাইতুল্লাহ শরীফে যিনি আশ্রয়প্রার্থী হবেন বলা হয়েছে, তিনি হলেন মাহদী। তবে এখানে দু'জন মাহদী আসবে। প্রথমজন হবে মিথ্যুক ও ভণ্ড, যার বিরূদ্ধে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হলে সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হবে না; বরং সে নিজেই নিহত হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হবেন সত্যিকার মাহদী, যার বিরূদ্ধে প্রেরিত বাহিনী ভূমিধ্বসে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

হাদীসে বলা হয়েছে, সত্য ও মিথ্যা মাহদীর মাঝের ব্যবধান হবে কিছুকাল। হাদীসে بُرْهَةً *শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অর্থ হলো, কিছু সময়। উলামায়ে কেরামের মতে এ 'কিছু সময়' বলতে ৩০ থেকে ৪০ বছর, কারো কারো মতে আরও কম বা বেশি! তবে সবচে বিশুদ্ধ মত হলো, এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কোনো বছর নির্ধারণ করার কোনো সুযোগ নেই। সেটা ৪০ বছর পরও হতে পারে, ৫০ বছর বা এর কিছু আগে পরেও হতে পারে। আল্লাহই ভালো জানেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, মিথ্যা মাহদীর মৃত্যুর কিছুকালের মধ্যেই সত্য ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে।*

মিথ্যা মাহদীর আত্মপ্রকাশ:

২০ নভেম্বর ১৯৭৯ সালে ফজরের সময় জুহাইমান আল ওতাইবী নামক একব্যক্তি অস্ত্র ও লোকবল নিয়ে আকস্মিকভাবে বাইতুল্লাহর দখল নিয়ে নেয়। তারপর মাইক হাতে সৌদি সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতি ও দুঃশাসনের বিবরণ দিয়ে ঘোষণা করলো যে, এখন এ থেকে মুক্তির সময় এসে গেছে। রাসুল সা. হাদীসে যে মাহদীর কথা বলেছিলেন সে মাহদী এখানে উপস্থিত। তারপর সে লোকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তিকে সামনে আসতে বললো। লোকটি ধীরগতিতে উঠে এসে রুকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়ালো। এরপর জুহাইমান বললো, এই হলো সে প্রতিশ্রুত মাহদী। দেখো, এর নাম মুহাম্মাদ, পিতার নাম আব্দুল্লাহ। সে কুরাইশের কাহতান বংশের লোক। রাসুল (সা.) এর ভবিষ্যত বাণী অনুযায়ী কুরাইশ বংশীয় মাহদী এই স্থানেই বাইয়াত গ্রহণ করবে। অতএব তোমরা সবাই তার হাতে বাইআত হয়ে যাও।

চিত্রঃ ভন্ড মাহদী মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ কাহতানি (বামে) ও তার সহচর জুহাইমান ওতাইবি

লোকেরা ভয়ে সবাই তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে। জুহাইমান কাবা শরীফের বিভিন্ন কক্ষে আগে থেকেই গোপনে এবং জানাযাবাহী খাটিয়ায় করে অনেক অস্ত্র মজুদ করে রেখেছিলো। সে টেলিফোনসহ সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিলো। তারপর তিনদিন পর্যন্ত কাবা দখল করে থাকলো। অবশেষে সৌদি সেনাবাহিনী ফ্রান্স ও পাকিস্তানের স্পেশাল ফোর্সের সাহায্যে তাদের বিরূদ্ধে অভিযান শুরু করে। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর তারা কাবা শরীফকে মিথ্যা মাহদীর দখলমুক্ত করতে সক্ষম হয়। এতে ১২৭ জন সেনা ও পুলিশ নিহত এবং ৪৫১ জন আহত হয়। তাদের ২৬০ জন নিহত হয় এবং জুহাইমান সহ তার ৭০ জন সহচর গ্রেফতার হয়। তিনদিন পর তাদের ৬৩ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় এবং বাকীদের সাজা দেওয়া হয়।

ঘটনাটির তথ্যসূত্র ও ইন্টারনেট লিংক

(ভিডিও ইংরেজি)

https://www.youtube.com/watch?v=Hltn3u02RwU

(ভিডিও বাংলা)

https://www.youtube.com/watch?v=eiXVCmxN-LQ

(বিবিসি বাংলা)

http://www.bbc.com/bengali/news-42124824

উপরের ঘটনার আলোকে দেখা যাচ্ছে, কাবা শরীফে মিথ্যা মাহদীর আত্মপ্রকাশ ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। আর হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী তার কিছুকাল পর তথা ৪০ বা ৫০ বা ৯০ বছর কিংবা এর কিছু আগে-পরে সত্যিকার মাহদী আত্মপ্রকাশ করবেন। এখন ২০১৯ সাল। ইতিমধ্যে ঘটনার ৪০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। জানি না, দু'এক বছর বা আট, দশ বছরের মধ্যে কিংবা আমাদের জীবদ্দশায়ই সত্য মাহদীর আত্মপ্রকাশ ঘটে কিনা? প্রবল সম্ভাবনা মনে হচ্ছে। আল্লাহই ভালো জানেন। তবে দাজ্জালের আবির্ভাব সংক্রান্ত এর চেয়েও আশ্চর্যজনক আরেকটি ঘটনা আমাদেরকে প্রায় দৃঢ়বিশ্বাসই করিয়ে দিচ্ছে যে, ইমাম মাহদীর আগমন সন্নিকটে! সে ঘটনা নিচে উল্লেখ করব।

একটি ইলহাম ও অদ্ভুত স্বপ্নঃ

হাফেজ্জী হুজুরের নামে একটি কথা মশহুর আছে। ইলহামের মাধ্যমে অবগত হয়ে তিনি ১৯৭৯ অথবা ১৯৮০ সালে বলেছিলেন (সে বছর) ইমাম মাহদী জন্মগ্রহণ করেছেন। আমি আজ থেকে প্রায় অনেক বছর আগে থেকেই ঘটনাটির ব্যাপারে অবগত ছিলাম। বিভিন্ন সময় আলোচনাও করেছি। কিন্তু কিছুদিন আগের একটি ঘটনা সেই ঘটনাকে আরও বেশি অর্থবহ করে দিয়েছে।

ঘটনাটি হচ্ছে-

আহলে হাদিস আলেম ডঃ কাজী ইবরাহীম বলেন, "তার এক ভাই (ইউসুফ) মদীনা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে। ইউসুফের একজন বন্ধু যার সাথে হাফেজ্জী হুজুর (রাহিঃ) এর সাথে ভাল সম্পর্ক ছিল। সে স্বপ্নে দেখে হাফেজ্জী হুজুর তাকে বলছে ২০১৯ সালে ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশ করবে! ইউসুফ তখন স্বপ্নের তাবীরের জন্য আমাকে জিজ্ঞেস করেছে।"

ভিডিও লিংকঃ

https://m.youtube.com/watch?v=qK4E7nelm1s

দাজ্জাল সংক্রান্ত ফিলিস্তিনের এক আজীব ঘটনাঃ

গত ২০০৮ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী প্যালেস্টাইনের টিভি চ্যানেল আল আকসা (Al Aqsa TV) তে সেখানকার একজন আলেম ঈসা বাদওয়ান এক সাক্ষাতকারে এক বিস্ময়কর তথ্য দেন। যা নিশ্চিতভাবে মুসলিম জাহানের জন্য ভাবার বিষয় এবং সতর্কবার্তা।

এখানে সাক্ষাতকারের অংশটি তুলে ধরছি।

ঈসা বাদওয়ানঃ একজন লোক, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি এবং বিশ্বাস করি, সঙ্গত কারণেই আমি তার নাম বলতে চাচ্ছি না - তো তিনি একদিন রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একজন বৃদ্ধ স্ত্রীলোক তাকে থামালো এবং ঐ স্ত্রীলোককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। কারণ, ঐ বৃদ্ধার মেয়ে ঐ হাসপাতালে সন্তান প্রসব করেছে। লোকটি ঐ বৃদ্ধার অনুরোধটি রাখল এবং তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে হাসপাতালের বাইরে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করল। এক ঘণ্টা পরে ঐ বৃদ্ধা তার মেয়ে এবং মেয়ের নবজাতক শিশুপুত্রকে নিয়ে বের হয়ে গাড়িতে উঠল। যখন তারা গাড়িতে উঠল, তখন ঐ নবজাতক সবাইকে অবাক করে দিয়ে সালাম দিল। আমরা অবাক হয়ে সালামের উত্তর দিলাম।

সাক্ষাতকার গ্রহণকারীঃ নবজাতক কথা বলে উঠল?

*ঈসা বাদওয়ানঃ হ্যাঁ, নবজাতক শিশুটি। এবং আমরা এটা শেখ নিজারসহ অন্যান্য আলেমকে জানিয়েছিলাম তখন। তো লোকটি যা বলল তা হল যে, শিশুটি বলল, **“আমিই হলাম সেই বালক যাকে দাজ্জাল হত্যা করবে, এরপরে আর কাউকে সে হত্যা করতে পারবে না।"***

হাদিসটি হচ্ছে-

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করলে ঈমানদার ব্যক্তিদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার কাছে যাবে। তার সাথে দাজ্জালের প্রহরীদের দেখা হবে।

তারা তাকে বলবে, ‘কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করছ’?

সে বলবে, ‘আমি এই আবির্ভূত ব্যক্তির কাছে যেতে ইচ্ছা করছি’।

প্রহরীরা বলবে, 'আমাদের রবের প্রতি কি তোমাদের ঈমান নেই'?

সে বলবে, 'আমাদের রবের ব্যাপারে তো কোনরূপ গোপনীয়তা নেই'।

তারা বলবে, 'একে হত্যা কর'।

কিন্তু এদের মধ্যে কেউ কেউ বলাবলি করবে, 'তোমাদের রব কি তোমাদেরকে তার অগোচরে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে নিষেধ করেননি'?

সুতরাং তারা তাকে দাজ্জালের কাছে নিয়ে যাবে। যখন মু'মিন ব্যক্তি দাজ্জালকে দেখবে তখন বলবে, 'হে লোক সকল! এই তো সেই দাজ্জাল যার প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন'।

এরপর দাজ্জালের নির্দেশে তার দেহ হতে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। তার পেট ও পিঠ উন্মুক্ত করে পিটানো হবে আর বলা হবে, 'তুমি কি আমার প্রতি ঈমান স্থাপন কর না'?

উত্তরে মু'মিন ব্যক্তি বলবে, 'তুমিই তো সেই মিথ্যাবাদী মাসীহ দাজ্জাল'।

সুতরাং তার নির্দেশে মু'মিন ব্যক্তির মাথার সিঁথি হতে দু'পায়ের মধ্য পর্যন্ত করাত দিয়ে চিরে দু'টুকরা করা হবে। দাজ্জাল তার দেহের এ দুই অংশের মধ্য দিয়ে এদিক হতে ওদিকে গমন করবে। এরপর সে মু'মিন ব্যক্তির দেহকে সম্বোধন করে বলবে, 'পুর্বের মত হয়ে যাও'।

তখন সে আবার পরিপূর্ণ মানব হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। আবার সে বলবে, 'এখন কি তুমি ঈমান পোষণ কর?'

মু'মিন মানবটি বলবে, 'তোমার সম্পর্কে এখন আমি আরো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম'।

সে মানবদেরকে ডেকে বলবে, 'হে মানবমণ্ডলী! আমার পর এ আর কারো কিছু করতে পারবে না'।

দাজ্জাল পুনরায় তাকে হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু আল্লাহ তার ঘাড়কে গলার নিচের হাড় পর্যন্ত পিতলে মুড়িয়ে দেবেন। ফলে সে তাকে হত্যা করার আর কোন উপায় পাবে না। বাধ্য হয়ে সে তার দু'হাত ও দু'পা ধরে ছুঁড়ে ফেলবে। মানুষে ধারণা করবে দাজ্জাল তাকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে বেহেশতে নিক্ষিপ্ত হবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'এই ব্যক্তি বিশ্ব জগতের রব আল্লাহর কাছে মানবের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত স্তরের শহীদের মর্যাদা লাভ করবে'।

সুতরাং আমরা হাদিস থেকে জানি যে, দাজ্জাল যাকে হত্যা করে জীবিত করবে এবং আবার হত্যা করবে কিন্তু পরে আর জীবিত করতে পারবে না। সে হবে একজন যুবক। যাকে শ্রেষ্ঠ শহীদ বলা হয়েছে। আর যুবক বলতে ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সকেই বুঝায়।

আমি মনে করি, এই ঘটনা আমাদের জন্য অনেক খুশির খবর বহন করে। কারণ, আমরা হাদিস থেকে জানি যে, দাজ্জালের আগমন ঘটবে ইমাম মাহদির উপস্থিতিতে ইস্তাম্বুল জয়ের পর।

সাক্ষাতকার গ্রহণকারীঃ এখন সেই বাচ্চার কি অবস্থা?

ঈসা বাদওয়ানঃ হ্যাঁ, এখন আমরা আলেমরা তাকে চিনি। এবং আমরা তার খেয়াল রাখছি। আমি সব মানুষকে এবং সব আলেমদেরকে জানাতে চাই যে, বিজয় অতি নিকটে। ইমাম মাহদি এখন আমাদের মাঝেই অবস্থান করছে (এই বাচ্চার জন্মের উপর ভিত্তি করে) ইনশা আল্লাহ্, প্যালেস্টাইনবাসী, খুব শিগগিরই এ বিজয়ের সাক্ষী হবে এবং এই ধর্মকে (ইসলামকে) ও এর আলোকে ছড়িয়ে দিবে।

(সাক্ষাতকারের অংশ বিশেষ শেষ)

এই শিশুটির জন্ম হয় ২০০৪ সালে। আর উদ্বিগ্নের বিষয় হল, ২০০৮ সালে এই সাক্ষাতকার জনসম্মুখে প্রকাশ হবার কয়েক মাস পর ২০০৮/২০০৯ সালে ইসরাইল রাসায়নিক গ্যাস প্রয়োগ ও বোম্বিং শুরু করে ১৪০০ শিশু হত্যা করে এবং প্রায় ৪০০০ শিশুকে আহত করে। শুধু তাই নয়, ইসরাইল এই সাক্ষাতকারে উল্লেখিত আলেম শেখ নিজারকে হত্যার উদ্দেশ্যে সাক্ষাতকারের ১১ মাস পরে এফ ১৬ বিমান দিয়ে ২০০০ পাউন্ডের বোমা নিক্ষেপ করে। যার ফলে শেখ নিজার তার চার স্ত্রী ও এগার সন্তানসহ শহীদ হন। শেখ নিজার ছিলেন গাজার অন্যতম প্রভাবশালী আলেম। তিনি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইমাম সাউদ বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বীন শিক্ষা লাভ করেন। এর পাশাপাশি তিনি ইসরাইলের সাথে যুদ্ধরত আল কাসসাম মুজাহিদ ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কমান্ডারও ছিলেন।

২০০৪ সনে জন্ম গ্রহণকারী এই বাচ্চাই যদি সেই সে যুবক হয়, তবে সে ২১ থেকে ২৫ বছর বয়সী যুবক হবে ২০২৫ থেকে ২০২৯ সালে। দাজ্জাল দুনিয়াতে আত্মপ্রকাশের পর ৪৩৯ দিন বা এক বছরের একটু বেশি সময় অবস্থান করবে এবং এই সময়ের মধ্যে যুবককে হত্যা করবে। মহাযুদ্ধের সপ্তম বছরে যেহেতু দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হবে, তাতে মহাযুদ্ধের সম্ভাব্য সাল আসে ২০১৮ থেকে ২০২২, আর মহাযুদ্ধ ইমাম মাহদির উপস্থিতিতেই হবে।

যা হোক, এগুলো সবই শুধু ঐ বাচ্চার দাবীর উপর ভিত্তি করে হাদিসের মাধ্যমে গণনা। কিন্তু একমাত্র আল্লাহই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানেন।

তবে, অবশ্যই সতর্ক বিশ্বাসী বান্দা হিসাবে আমরা আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করব এবং সজাগ দৃষ্টি রাখবো হাদিসে বর্ণিত মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর প্রতিটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সর্বোপরি সামরিক পরিস্থিতির উপর।

জেরুসালেমে ইহুদীদের আবাদ ও একটি হাদিসঃ

মুআজ ইবনু জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

"বাইতুল মুকাদ্দাস আবাদ হওয়া মদিনা বিরান হওয়ার নিদর্শন। আর মদিনা বিরান হওয়া তীব্র লড়াইয়ের সুচনা। তীব্র লড়াইয়ের সুচনা হলো কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়। আর কনস্ট্যান্টিনোপল বিজিত হওয়া দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ।"

এখানে বাইতুল মাকদিস আবাদ হওয়া দ্বারা ফিলিস্তিনে ইহুদীদের দখলদারিত্ব উদ্দেশ্য। আজ যেমন বিশ্ব রাজনীতি ও ওপেন ফ্রন্ট থেকে মদীনা বিলীন হয়ে গেছে তেমনই জেরুসালেম (বাইতুল মাকদিস) আজ সারা পৃথিবীর লাইমলাইটে রূপান্তরিত হয়েছে! ১৯৪৮ সালের ১৪ ই মে' ইহুদীদের দ্বারা ফিলিস্তিন অধিকৃত হয়। সেই থেকে তারা বছরে বছরে জেরুসালেমকে তাদের জবরদখলী রাষ্ট্র ইজরাঈলের রাজধানী ঘোষণা দিতে প্রস্তুত হয় কিন্তু অজানা কারণে সেটা পিছিয়ে দেওয়া হয়! অবশেষে ট্রাম্প এসে হঠাৎ করে জেরুসালেমকে ইজরাঈলের রাজধানী ঘোষণা দিল। কেঁপে উঠল সারা দুনিয়া। আনুষ্ঠানিকভাবে সমগ্র জেরুসালেম ইহুদীদের হয়ে গেল! কিন্তু তখনো জেরুসালেমে ইজরাঈল নিজেদের কার্যক্রম স্থানান্তর করেনি। আমেরিকা ঘোষণা দেয় ১৪-ই মে আমেরিকা তার এমবেসি জেরুসালেম স্থাপন করবে! বিশ্ব জুড়েই সৃষ্টি হওয়া জল্পনা কল্পনার শেষে লাখো ফিলিস্তিনির নিস্ফল রোদনের মাঝ দিয়ে ১৪ মে আমেরিকা তাদের অফিস জেরুসালেম স্থানান্তর করে! এর ফলে বাইতুল মাকদিসে ইহুদীদের আবাদ চূড়ান্ত পর্যায় স্পর্শ করেছে। এটি হল কিয়ামত ও আখেরুজ্জামানের একটি স্পষ্ট ও বৃহৎ নিদর্শন।

১৪ ই মে ২০১৮, জেরুসালেমে আমেরিকার কূটনৈতিক অফিস স্থাপনের ঘটনায় প্রতিবাদ করে প্রাণ হারায় অনেক ফিলিস্তিনি, আহত সহস্রাধিক। একজন অনলাইন একটিভিস্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মত প্রকাশ করেছে এভাবে-

"★ জেরুসালেমে স্থানান্তরিত হলো ইসরাঈলস্থ মার্কিন দূতাবাস!

★ অর্ধশতাধিক ফিলিস্তিনী মুসলিম নিহত, আহত সহস্রাধিক!

যারা জাতিসংঘের উপর আস্থা রাখেন, যারা তথাকথিত বিশ্বমোড়লদের বিশ্বাস করেন, যারা তথাকথিত মুসলিম শাসকদের উপর নির্ভরশীল, যারা মানবাধিকার সংস্থাসমূহকে বিশ্বাস করেন, আমার বক্তব্য তাদের জন্য নয়।

আজও যে সকল মুসলিমরা জাতিসংঘকে দু'মুখো সাপ মনে করে তারা ভুল করে। বিষাক্ত সরীসৃপটার লেজটাকেও মুখ ভেবে অনেক মুসলিম বিভ্রান্ত হচ্ছে। কারণ, জাতিসংঘ তার লেজটা চমৎকার করে নাড়াতে পারে। জাতিসংঘের মুখ দুটো নয়, কখনই ছিল না। মুখ তার একটাই। আর সেই মুখের বিষাক্ত ছোবলে কেবল মুসলিমদের রক্ত নীল হয়।

তথাকথিত বিশ্বমোড়ল। এদেরকে যে সকল মুসলিম ভাইয়েরা ভণ্ড বলে তারা বিভ্রান্তির শিকার। ভণ্ড তারা মোটেও নয়। তারা সঠিকভাবেই তাদের কাজ করছে। তাদের কাজ- শয়তানের এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করা, মানুষকে জাহান্নামের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা, আর বেয়াড়া মুসলিম খতম করা। বিশ্বমোড়লরা তাদের দায়িত্ব পালন করছে সততার সাথে। এখানে তারা কোনপ্রকার দ্বিচারিতার আশ্রয় নিচ্ছে না। বরং যারা তাদেরকে ভণ্ড বলে তাদের বসবাস বোকার স্বর্গে।

রক্তাক্ত মুসলিম নারীর অপমানে, বোমায় ঝলসে যাওয়া মুসলিম শিশুর আর্তনাদে, গৃহহারা মুসলিমের আহাজারিতে অস্থির ও চঞ্চল হয়ে যে মুসলিমরা চিৎকার করে ধিক্কার জানায়, 'মানবাধিকার সংস্থা কোথায়?'

আমি বলব, সে সকল ধিক্কার জানানো মুসলিমরা আজও মায়ের গর্ভে আছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে তুমি ধিক্কার জানাচ্ছ কেন? তোমার ধিক্কারের আওয়াজ শুনে মনে হয়- তুমি বিশ্বাস কর যে, তারা সত্যিই মানুষের অধিকার সংরক্ষণে কাজ করে। অথচ তুমি জানো না যে, মানবাধিকার গোষ্ঠী মুসলিমদের মানুষই মনে করে না।

এ জামানার তথাকথিত মুসলিম শাসকদেরকে যারা ফাসিক, জালিম, মুনাফিক ইত্যাকার বিশেষণে ভূষিত করে তাদের মতো আত্মপ্রবঞ্চক বোধহয় আর কেউ হতে পারে না। ফাসিক, জালিম, মুনাফিক - এ তো আদুরে গালি! অথচ তারা জানে না এ সব শাসকেরা আদুরে গালির স্তর অতিক্রম করে কুফরীতে কামালিয়াত হাসিল করে অনেক উঁচু মর্তবায় পৌঁছে গেছে। তারা কাফের সর্দারদের সাথে ফানা হয়ে গেছে যেভাবে চিনি পানির সাথে মিশে যায়। এরপরও এ ফানা ফীশ শয়তানের হাকিকত যারা বুঝতে অক্ষম তারা আত্মপ্রতারক ছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে।

তাহলে?

বাকি রইল ইতস্তত, বিক্ষিত উড়তে থাকা কিছু জোনাকি যাদের নিজের প্রয়োজন মেটানোর আলো আছে বটে, কিন্তু সে আলোয় না কাটে আঁধার আর না হতে পারে আগুন। যে আগুন দাবানল সৃষ্টি করে আল্লাহর জমিনে জমতে থাকা স্তুপিকৃত জঞ্জাল পুড়িয়ে পৃথিবীটাকে মানুষ বসবাসের উপযোগী করতে পারে।

তবে, আমি হতাশ নই। দুনিয়ার বুকে একদিন কলেমার পতাকা উড়বেই; পৃথিবী মনুষ্যজাতি বসবাসের উপযোগী হবেই।"

ইজরাঈল কি দাজ্জালের অপেক্ষায়?

ইহুদী ধর্মগ্রন্থ তালমুদে তাদের মাসীহ (দাজ্জাল) এর আগমন নিয়ে বিস্ময়কর আলোচনা আছে। বাইতুল মাকদিস দখলও তাদের মাসীহ দাজ্জালের আগমনেরই একটি অংশ। মধ্যপ্রাচ্যের এই অস্থিতিশীলতা নিয়ে ইজরাঈলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছে- "মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি মসীহ'ও (দাজ্জাল) আগমনের পরেই হবে"

এ ইস্যুতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একজন আলেম নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে লিখেছে-

"★ মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি মসীহ'ও (দাজ্জাল) আগমনের পরেই হবে - ইসরাঈলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী, বৃহস্পতিবার। (সূত্রঃ জেরুজালেম পোস্ট)

সংঘাতকে যারা কেবল জাতীয়তাবাদী পলিটিক্যাল সঙ্কট বলে ভাবেন তারা আরো একবার ভাবুন। আমরা বারবার বলছি ইসরাঈলের বিষয়টা রাজনৈতিক নয়, ধর্মীয়। শেষতক পরিণতি ঐ দিকেই গড়াবে এবং ইরান, ইসরাইল ও আরবের ত্রিকৌণিক রাজনৈতিক আধিপত্যের মেরুকরণটা পাল্টে যাবে। এ স্থানটা দখলে নিবে অ্যারামেগডন বা হারমাজিদ্দুন, ক্রুসেড এবং জিহাদ। এ লড়াইয়ে রাষ্ট্র গুলো আর মুখ্য থাকবেনা। জনগণ কেন্দ্রিক হবে পরবর্তী এ সমীকরণ।

ইসরাঈলের মন্ত্রী যার কথা বলেছেন সে শয়তানটা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট/প্রধাণমন্ত্রী হয়ে আসবেনা। ইয়াহুদী জাতির নেতা হয়ে আবির্ভূত হবে। কাউন্টারে মুসলমানদের হজরত ঈসা (আঃ) *এবং তারও আগে হজরত মাহদী রাষ্ট্র হয়ে নয়, জনগণের নেতা হয়ে আবির্ভূত হবেন।"*

এরকম অনেক ঘটনা, যা শুধু আমাদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোনের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইহুদী খ্রীস্টান ধর্মের নানা ঘটনা, লক্ষণ, ভবিষ্যদ্বাণী থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে আমরা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছি! সকল আহলে কিতাবরাই এই সময়গুলিকে মূল্যায়ণ করছে! ক্রিমিয়া দখল, জেরোসালেমকে ঈজরায়েলের রাজধানী ঘোষণা, সৌদি বাদশার উত্তরাধিকার নিয়ে রাজপুত্রদের মাঝে কলহ, ব্লু মুনসহ সীমাহীণ আলামত আমাদেরকে শেষ দিবসের লক্ষণগুলির অস্তিত্ব জানান দেয়!

সেই সাথে জানিয়ে দেয় হিন্দুস্তানের মহারণ হুংকার দিচ্ছে। আজ অথবা কাল!

কি করব আমি?

রাসুল (সা.) সাধ্যমত প্রস্তুতি নিয়েই বদরের ময়দানে হাজির হয়েছেন। সুতরাং আমাদেরকেও সাধ্যমতো প্রস্তুতি নিতে হবে।

আমরা শুধু এ পর্যায়ে একজন মুসলিম অথবা একজন একাকী মুজাহিদের জন্য গাজওয়াতুল হিন্দের প্রস্তুতিস্বরূপ কী করা যেতে পারে অথবা কেমন হবে প্রস্তুতি সেই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত দিক নির্দেশনা দিবো। আমরা আশা করি আপনি পুরো লিখাটি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করলে এবং এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে এবং বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলে অবশ্যই গাজওয়াতুল হিন্দের প্রস্তুতির ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন। এবং বলাই বাহুল্য আমাদের আজকের এই আলোচনা গাজওয়াতুল হিন্দের সঠিক ও সুষ্ঠু প্রস্তুতির জন্য। আমরা আপনাদের জন্যে প্রস্তুতিমূলক কিছু সুন্দর নির্দেশনা সংগ্রহ করেছি। গাজওয়াতুল হিন্দের সাথে যুক্ত সকল ভাই-বোনকে আল্লাহ্ কবুল করুন!

মোটা দাগে করনীয়ঃ

সময় হাতে বেশি বাকি নেই। প্রস্তুতি গ্রহণের এখনই সময়।

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রায় সবক'টি মুসলিম দেশে যে পরিস্থিতি চলছে এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও কুফরের সংঘাত সামগ্রিক বিচারে ক্রমশ যে তীব্রতা ধারণ করছে, সর্বোপরি এত স্বল্পতম সময়ের ব্যবধানে পরিস্থিতি যে হারে বদলে যাচ্ছে সেসব কিছুর আলোকে অনেকটা নিশ্চিত করে বলা যায়, আমাদের আর বেশি সময় বাকি নেই। যেকোন সময়, যেকোন মুহূর্তে দেশ বড় ধরনের কিছু একটা ঘটে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে যেন। এবং কিছু একটা শুরু হয়ে গেলে দেশের মানুষ আক্রান্ত হলে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলির মত স্বাভাবিকভাবে চার ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে।

প্রথম ভাগঃ যারা উচ্চবিত্ত, বিলাসী প্রকৃতির, সমাজের এলিট শ্রেণীর লোকজন, বিভিন্ন দেশের সাথে যাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যোগসাজশ আছে তারা নিশ্চিন্তে সোজা ওইসব দেশে গিয়ে ঠাই নেয়ার চেষ্টা করবে।

দ্বিতীয় ভাগঃ যারা মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সাধারণ শ্রেণীর লোকজন, দ্বীন ধর্মের সাথে যাদের বিশেষ একটা সম্পর্ক নেই, মানে যারা জিহাদ-কিতালের ব্যাপারে, কাফেরদের প্রতিরোধের ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রস্তুত না (সংঘাতটা যেহেতু ইসলামী ইস্যুতে হবে। জাতীয়তাবাদ বা অন্যকোন ইস্যু না) তো এরা দলে দলে, লাখে লাখে মারা পড়বে।

এবং শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিবে (যদিও সম্ভাবনা কম)।

তৃতীয় ভাগ: উপরোল্লিখিত উভয় শ্রেণীর অনেকেই পার্থিব স্বার্থ রক্ষায় শত্রুপক্ষের দালাল হয়ে কাজ করবে। এদের মধ্যে অনেক আলেম উলামাও থাকবে।

চতুর্থ ভাগ: দ্বীন ধর্মের সাথে যাদের সম্পর্ক ভাল। এক কথায় যারা প্র্যাকটিসিং মুসলিম, সেই সাথে আগ থেকেই শারীরিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিকভাবে না হলেও অন্তত মানসিকভাবে যারা জিহাদের ব্যাপারে প্রস্তুত ছিলেন তারা এবং একমাত্র তারাই আগ্রাসী শত্রুর মুকাবেলায় জীবন-মরণ প্রতিরোধ চালিয়ে যাবেন। তারাই কেবল ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হবেন। অন্য কেউ নয়।

এখন প্রত্যেকে নিজের অবস্থার দিকে গভীর মনযোগ দেওয়া জরুরি যে, সেই পরিস্থিতিতে আমি উল্লেখিত চার শ্রেণীর কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবো?

এজন্য এখন থেকেই যদি নিজেকে সেই কঠিন সময়ের জন্য প্রস্তুত করে না তুলি, সেই রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য আগাম প্রস্তুতি না নেই তাহলে সেই সময় কাজের কাজ কিছু করতে পারা দূরে থাক, ময়দানে থেকে গেলেও 'কাজের মানুষদের' জন্য কেবলই বোঝা হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবেনা।

তো, অন্তত কাজের সময় 'কাজের মানুষদের' বোঝা না হয়ে সহযোগিতামূলক যেন কিছু করতে পারি, তাদের 'আনসার' এর ভূমিকায় থাকতে পারি সেই বিষয়ে বাস্তবসম্মত জরুরী দিকনির্দেশনা মূলক কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা করছি। আল্লাহই উত্তম তাওফীকদাতা।

এক) জিহাদ বিষয়ে নিজের মনে উঁকি দেওয়া অথবা অন্যের পক্ষ থেকে আরোপিত যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়, অভিযোগ-আপত্তি, বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা দূর করা আবশ্যক। অন্যাথায় জিহাদ শুরু হয়ে যাওয়ার পর যখন দেখা যাবে, একদল দরবারী আলেম তাগুত-কাফেরের তোষামোদি ও দালালী করার বিনিময়ে পার্থিব বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ ভোগ করছে তখন নিজের অবস্থান নড়বড় হয়ে যেতে পারে। তাই এক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনার বিকল্প নেই। পড়তে হবে- জিহাদ বিষয়ক কুরআনের আয়াত সমূহের তরজমা ও তাফসীর, নির্ভরযোগ্য কোন তাফসীরের আলোকে। এ বিষয়ক হাদিস সমূহ ও তার ব্যাখ্যা নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবাদী ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের আলোকে। এ বিষয়ক ফিক্বহী মাসায়েল মুজতাহিদীন ফুক্বাহায়ে কেরামের ফিক্বহ ও ফতওয়ার আলোকে। এবং সেইসাথে সমকালীন মুজাহিদীন উলামা ও উমারার রচিত রাসায়েল (পুস্তিকা) ও মাক্বালাত (প্রবন্ধ-নিবন্ধ) অধ্যয়ন করতে হবে।

দুই) এখন থেকেই নিয়মিত বিশ্বব্যাপী চলমান জিহাদে মুজাহিদীনের খোঁজ খবর রাখুন।

তিন) প্রতিদিন সকালে কমপক্ষে পঞ্চাশটি বুক ডন দিন। (বুক ডন দেওয়ার সময় দৃষ্টি সামনের দিকে রাখুন) পেটের ভূরি/মেদ একেবারে কমিয়ে আনুন। ফজরের পরের ঘুম একেবারে বর্জন করুন।

চার) যেকোন রকম খাবারে অভ্যস্ত হয়ে উঠার চেষ্টা করুন। যেমন, দেশি-বিদেশি, মশলাসহ, মশলা ছাড়া।

পাঁচ) বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ অন্যান্য সকল প্রকারের প্রযুক্তিগত সুযোগ সুবিধা ছাড়া চলার অভ্যাস গড়ে তুলুন। যেমন, প্রচণ্ড গরমে ফ্যান ছাড়া, রাতে বৈদ্যুতিক লাইট ছাড়া, সফরে মোবাইল ছাড়া চলার চেষ্টা করুন।

ছয়) গরমের দিনে লাগাতার কয়েকদিন গোসল ছাড়া ও শীতের দিনে প্রতিদিন সকালে গোসল করার অভ্যাস করুন। এভাবে প্রচণ্ড শীতের রাতে মাত্র একটা মাফলার বা রুমাল এবং হালকা পাতলা একটি কম্বল জড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেওয়ার অভ্যাস করুন। খাবার ও গোসলের জন্য স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ পানি ছাড়াও চলার অভ্যাস করুন।

সাত) বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া রিক্সায়/অটোতে চড়বেন না। যেমন, ২০/৩০ টাকা রিক্সা ভাড়ার পথ নিয়মিত হেঁটে চলার অভ্যাস করুন। বর্ণিত আছে, মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী রহ. ত্রিশ কিলোমিটারের চেয়ে কম দীর্ঘ পথে কখনো যানবাহনে চড়তেন না। তাঁরাই ছিলেন আমাদের প্রকৃত পূর্বসূরি।

আট) ঘরকুনো স্বভাব বর্জন করুন। যেকোন সময়, যেকোন মুহূর্তে অনির্দিষ্টকালের জন্য দূর থেকে দূর গন্তব্যে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফরের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার অভ্যাস করুন। যেমন, সফরের সিদ্ধান্ত ঘোষণার মাত্র আধা ঘন্টা বা তার চেয়ে কম সময়ে প্রস্তুতি নিয়ে পাঁচ-ছয় শ' বা সাতশো কিলোমিটার দূরের সফরে বেরিয়ে পড়ুন।

নয়) পনেরো/বিশ কেজি সামানা কাঁধে বহন করে দীর্ঘ পথ চলার অভিজ্ঞতা অর্জন করুন।

দশ) গভীর রাতে বনজঙ্গল বা পাহাড়ি এলাকায় দুয়েকজন মিলে বা একাকি চলার সাহস অর্জন করুন।

এগারো) ড্রাইভিং শিখুন। বিশেষত, মোটরসাইকেল চালানো শিখুন। অন্তত ৭০/৮০ কি.মি. বেগে চালানোর অভিজ্ঞতা অর্জন করুন।

বার) সাঁতার শিখুন। বিশেষত, ডুব সাঁতার এবং খরস্রোতা নদীতে এবং প্রচণ্ড ঢেউয়ের মাঝে সাঁতার কাটা শিখুন। খুবই জরুরী। পাশাপাশি নৌকা চালানোও শিখুন।

তেরো) গাছে চড়া, পাহাড়ে চড়া শিখুন। পাহাড়ে উঠানামার জন্য সাধারণ পর্যটকদের পথ (যথা, ইকোপার্ক বা পাহাড় কাটা সিঁড়ি) বাদ দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে লত বেয়ে উঠানামা করা শিখুন। এভাবে সিঁড়ি ছাড়া (জানালার সানসেট ও ভেন্টিলেটর দিয়ে) বিল্ডিং থেকে নেমে যাওয়া শিখুন।

চৌদ্দ) ঘোড়ায় চড়া এবং ঘোড়দৌড় শিখুন।

পনেরো) নিশানা তাক করা শিখুন। প্রথমে হাতে, তারপর গুলাইল দিয়ে অতঃপর পাখি শিকার করার এয়ারগান দিয়ে।

ষোল) কুংফু, কারাতে শিখুন।

সতেরো) রান্নাবান্না করা শিখুন।

আঠারো) প্রয়োজনীয় সেলাইর কাজ শিখুন।

উনিশ) জরুরি দাতব্য চিকিৎসা ও অস্ত্রোপাচার করা শিখুন।

বিশ) কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের বেসিক প্রোগ্রামগুলি শিখুন। যেমন, কম্পোজ করা, প্রিন্ট দেওয়া, ওয়েব ব্রাউজিং, ডাউনলোড, বিভিন্ন ফাইল আপলোড এবং কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের জেনারেল সিকিউরিটি সিস্টেমগুলো শিখুন।

একুশ) প্রতি মাসে উপার্জিত আয়ের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার অভ্যাস করুন।

বাইশ) বালিশ ছাড়া, বিছানা ছাড়া খালি ফ্লোরে বা সরাসরি মাটির উপর ঘুমানোর অভ্যাস করুন।

এখানের কোন কোন বিষয় আপনার কাছে অতিরঞ্জিত বা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। যেমন বালিশ বিছানা ছাড়া খালি ফ্লোরে ঘুমানোর বিষয়টা। কিন্তু যারা জালিমদের হাতে বন্দী হয়েছে এবং টর্চার সেলে মাসের পর মাস গুম হয়ে থেকেছে তারা ঠিকই উপলব্ধি করে যখন ঠান্ডা ফ্লোরে নগ্ন দেহটিকে পিছমোড়া করে হাত বাঁধা অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। অথবা খালি ফ্লোরেই শুয়ে ঘুমিয়ে দিন গুজরান করতে হয়। কিংবা সিরিয়া আরাকানের শরণার্থীরাই ভাল জানবে! তারা কতই না উত্তম যারা বান আসার আগেই নুহ (আঃ) এর মতো নৌকা তৈরি করে প্রস্তুতি নেয়!

এই প্রস্তুতিগুলো কার্যকরভাবে ফল দিবে যদি আমরা পরিকল্পনামাফিক অগ্রসর হই! যেমন নিজেদের পরিসরে যাদেরকে সমমনা পাওয়া যাবে তাদের সাথে মিলে গ্রুপ তৈরি করা। নিয়মিত আলোচনা করা, তালিম করা, প্রস্তুতির তদারকি হালনাগাদ করা, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা, একে অপরকে সাহায্য করা। ফান্ড গঠন করা। যুদ্ধকালীন সময়ে প্রতিরোধের পরিকল্পনা করা। নিজেদের পরিজনকে প্রস্তুত করা। ইত্যাদি...

এবং যারা আজকের এই দিনে ঈমানের কাফেলায় প্রবেশ করে কুফরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নাম লিখিয়েছেন বা লিখাবেন ভাবছেন তারা তো এটা দ্বারা উপকৃত হবেই কিন্তু সবার উচিত সকল মুসলিমদের গাজওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটিনাটি ও তথ্য বিশ্লেষণ জানিয়ে প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করা। একদিকে শুরু হতে যাওয়া মালাহামাতুল কুবরা, যা ক্রমান্বয়ে সারা পৃথিবীতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে আবার ভৌগোলিক ভাবে আমরা এমন একটি এলাকায় বসবাস করি যারা মোকাবেলা করবো গাজওয়াতুল হিন্দ। সুতরাং আমাদের প্রস্তুতিটাও হতে হবে এই উভয় সংকট মাথায় রেখে। প্রস্তুতিটাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিলে বুঝতে ও পদক্ষেপ নিতে সুবিধা হবে।

উপরে আমরা প্রস্তুতির অংশ হিসেবে বাইশটি পয়েন্টে কিছু বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা আলোচনা করেছি। যেগুলা অব্যাহতভাবে প্রতিজনই করতে পারে। কিন্তু আমরা শেষ যামানার সবচে ভয়াবহ যুদ্ধের প্রাক্কালে একজন মুসলিম ও তার সাথে জড়িত অপরাপর মুসলিমদের জন্যে জান-মাল, ঈমান, সম্মান ও সম্ভ্রম হিফাজতের জন্যে প্রস্তুতির একটি প্যাকেজ দিতে চাই-

(ক) আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি।

(খ) শারীরিক ও অস্ত্র প্রস্তুতি।

(গ) মানসিক প্রস্তুতি।

(ঘ) অর্থনৈতিক ও খাদ্য প্রস্তুতি।

(ক) আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিঃ-

এ যুদ্ধে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ মানে অর্ধেকেরও বেশী বিলুপ্ত হবার আশংকা রয়েছে, তাই ধরে নিবেন আপনিও তাদের মধ্যে একজন। আর যদি বেঁচেও যান তবুও নিচের প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন। আশা করি কল্যানের পথে ধাবিত হবেন।

মুসলিম হওয়ার জন্য কোরআন হাদীসে যে সব শর্ত বা বৈশিষ্টের কথা বলা হয়েছে তা পুরোপুরি মেনে চলার চেষ্টা করুন।

সকল ফরজগুলোর ব্যপারে কঠোর যত্নবান হোন।

যতটুকু সম্ভব কোরআন মুখস্থ করুন (ন্যূনতম নামাজের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয় সাথে সুরা কাহাফ এর ১ম ও শেষ ১০ আয়াত এবং জরুরী দোয়া সমূহ)।

সকলের সাথে দেনাপাওনা মিটিয়ে ফেলুন। ভুলত্রুটি বা কারো সাথে ঝগড়া মনোমালিন্য থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিন। বেশী করে তাওবা, এসতেগফার করুন।

প্রতিদিন কোরআন হাদিস অধ্যায়ন করুন, যতটুকু সম্ভব। কোরআন, হাদিস, তাফছিরসহ গুরুত্বপূর্ন কিছু বই এর হার্ড কপি নিজের কাছে, বাড়ির সবচেয়ে নিরাপদ এবং গোপন জায়গায় সংরক্ষন করুন।

সিনেমা, গান, নাটক এবং অসৎ সঙ্গ পরিহার করুন। আপনার পরিবার, নিকট আত্মীয়দের এসব ব্যপারে সতর্ক করুন।

(খ) শারীরিক ও অস্ত্র প্রস্তুতিঃ

১. প্রতিদিন ফজরে উঠুন, জামাতে সলাত আদায় করে শুরু করুন আল্লাহর জন্য। প্রথম ১ সপ্তাহ একটু শরীর ব্যাথা হবে। কিন্তু এই ব্যাথার জন্য আল্লাহ আপনাকে পুরস্কার দেবেন, ইনশাআল্লাহ। আর আপনার শরীর ফিট থাকবে। এক সপ্তাহ পর থেকে পুরো নরমাল হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

২. পুশআপঃ প্রথম দিন ৭ টা করে শুরু করুন। প্রতিদিন ১ টা করে বাড়ান।

সিট আপঃ প্রথম দিন ৭ টা করে শুরু করুন। প্রতিদিন একটা করে বাড়ান।

পুল আপঃ প্রথম দিন ৩ টা করে শুরু করুন। সপ্তাহে ১ টা করে বাড়ান।

৩. কোজেল ব্যায়ামঃ প্রথমদিন ৫ মিনিটস করুন। সপ্তাহে ১ মিনিটস করে বাড়ান। এই কোজেল ব্যায়াম খুবই উপকারী বোনদের জন্য। পিরিয়ড চলাকালীন এটা করলে অনেক স্বস্তি পাবেন।

৪. মার্শাল আর্টঃ এটা করলে এক্সট্রা বেনিফিট পাবেন, আর এটা কঠিনও নয়।

৫. ক্রলিং ব্যায়ামঃ প্রতিদিন হামাগুড়ি দিয়ে (ক্রলিং) বারান্দার এদিক থেকে ওদিকে যান, এইভাবে ৫-৭ মিনিটস করুন।

৬. পেশিতে ভর দেওয়াঃ দুটো ইট নিয়ে দুই হাতে উঁচু করুন এবং নিচে নামান।

৭. ধনুরাসনঃ ধনুরাসন করুন প্রতিদিন ২ মিনিটস মতো। বাড়াতেও পারেন নিয়মিত।

৮. দৌড়ঃ দৌড়ঝাঁপ করুন কমপক্ষে দুই কিঃমি। বোনেরা বাড়ির উঠোনে পায়চারী করুন, হাঁটুন।

এবারে খাওয়াদাওয়া তে আসুন-

ভাত অল্প খান, সাথে নিয়মিত রুটি রাখুন। একবেলা ভরা পেটে খান, অন্যবেলা একেবারে অল্প। কাঁচা ছোলা ভালো করে ধুয়ে বিশুদ্ধ পানিতে রেখে দিন, ভেজা পানি পান করুন এবং নিয়মিত ছোলা খান সকালে। সাথে গুড় রাখতে পারেন। ছাতু খেলে আরো উপকার। গরুর দুধ পান করুন। এটা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী ওষুধ। উল্টোপাল্টা খাবার যেমন তেলেভাজা কম খান, ফাস্টফুড বাদ দিন, সকল GMO ফুড বাদ দিন। শাক-সবজি বেশি বেশি খান। নিয়মিত প্রস্রাব পায়খানা করুন। চেপে রাখবেন না। সকালে টয়লেট করা খুবই ভালো, যদি না হয় তাও টয়েলেটে যান।

প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস এলোভেরা জুস পান করতে পারেন এবং অবশ্যই দুই কোয়া রসুন কুচিয়ে মুড়ি দিয়ে খান কিংবা ট্যাবলেট খাওয়ার মতো করে গিলে খেয়ে নিন। প্রতিদিন একটা করে ডিম হাফ বয়েল কিংবা সিদ্ধ খান। ফল ফলাদি বেশি খান। বেশি বেশি পানি পান করুন। আয়োডিন যুক্ত লবন ব্যাবহার করুন খাদ্যে। লেবুর রস দিয়ে এক গ্লাস পানি পান করুন প্রতিদিন সকালে। হার্ট বা ডায়াবেটিস রোগীরা লাউ/কদু এর জুস পান করুন। বিবাহিতরা কমসেকম সপ্তাহে দুদিন শারীরিক মিলন করুন। অবিবাহিতরা রোজা রাখুন, সামর্থ্য হলে বিবাহ করুন।

ফরজ নামাজের পর মুজাহিদীন ও মজলুমদের জন্য দোয়া করুন, আক্বিদা শিরক-বিদাত মুক্ত করুন।

এলোপ্যাথি ঔষধ কম ব্যবহার করুন। ভেষজ ঔষধ সম্পর্কে জ্ঞন অর্জন করুন। হিজামা চিকিৎসক হোন। কমন রোগ যেমন গ্যাস্ট্রিক, ডায়াবেটিস, জ্বর, মাথা ব্যথা, সর্দি এসবের জন্য ভেষজ ঔষদ গুলো বাড়িতে সংরক্ষন করুন। যেমনঃ গলঞ্চ, এলোভেরা, নীম, তুলসী, কালমেঘ ইত্যাদি।

বাড়িতে টিউভওয়েল বা চাপা কল বসান, সাপ্লাই পানির উপর নির্ভরতা ১০০% কমিয়ে ফেলুন।

কমপক্ষে ২ বছরের জন্য সাবান, ব্যন্ডেজ, স্যভলন, ব্লেড, সুঁই, সুতা, দিয়াশলাই, মোমবাতি, ব্যাটারি চালিত টর্চ লাইট ও ব্যটারি ক্রয় করে রাখুন। জ্বালানী বিহীন বিদ্যুৎ উৎপাদন করার চেষ্টা করুন।

পরিবারের সবার জন্য কমপক্ষে ২ টি করে রেইন কোর্ট, পর্যাপ্ত শীতের ভারি জামা, ও জরুরী জামা কাপড় ক্রয় করে রাখুন। শূন্য ডিগ্রি বা মাইনাস তাপমাত্রার উপযোগী পোশাক সংগ্রহ করুন।

পরিবারের সকলের জন্য ফিউম মাস্ক বা গ্যাস মাস্ক ১ টি করে এবং ডাস্ট মাস্ক পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করে রাখুন।

বসবাস করার জন্য যে কোন শহর, বন্দর ত্যাগ করুন। যত অজো পাড়া গাঁ হবে ততই ভালো। উত্তম হবে পাহাড়ী এলাকা ও প্রাকৃতিক ঝর্ণা বা অধিক বৃষ্টি হয় এমন এলাকা। বেশি জনবসতি এলাকা পরিহার করুন।

যারা একত্রে বসবাস করবেন তাদের নিরাপত্তার জন্য নিরাপত্তার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার চেষ্টা করুন ও হাতের কাছেই কোথাও লুকিয়ে রাখুন।

সকল পুরুষ সদস্য একত্রে ঘুমোতে বা কোথাও সফরে যাবেন না। গ্রুপ করে পালাক্রমে পাহারা দিন।

আশে পাশের জনপদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বাইসাইকেল সংগ্রহ করুন। দ্রুত যোগাযোগ করার পদ্ধতি আবিস্কার করার চেষ্টা করুন। ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করার অভ্যাস করুন।

মাটির নিচে ঘর তৈরি করুন, বাড়ি থেকে সহজে বের হওয়ার পথ তৈরি করে রাখুন।

তাঁবু তৈরি করার সরঞ্জাম ব্যবস্থা করুন। আপনার এলাকার অবসরপ্রাপ্ত বা কর্তব্যরত ডিফেন্স বাহিনীর সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে তাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষন গ্রহন করুন।

পাড়ায় পাড়ায় স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন করার চেষ্টা করুন। যদি সমস্যা না হয় স্থানীয় আইন প্রশাসন বা জন প্রতিনিধিদের কাছে বিষয়টি বুঝিয়ে অনুমতি নিয়ে নিন।

অস্ত্রঃ কয়েক ঘন্টা পরেই মালাহামা, গাজওয়াতুল হিন্দ শুরু হবে, মাহদি (আ.) পৃথিবীতে বর্তমান। আল্লাহ গায়েবের একমাত্র মালিক। আমি সহিহ হাদিস ও বিশ্ব পরিস্থিতি চিন্তা করেই বললাম।

অস্ত্র রাখা আল্লাহ্‌র হুকুম! আল্লাহ্‌ বলেন, **"আর স্মরণ করো! আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দুই দলের একটি তোমাদের দেওয়া হবে, আর তোমরা চেয়েছিলে যা অস্ত্রসজ্জিত নয় তাই তোমাদের হোক, অথচ আল্লাহ্‌ চেয়েছিলেন (তোমরা অস্ত্রধারী হও) যেন সত্য সত্য প্রতিপন্ন হয় তাঁর বাণীর দ্বারা, আর যেন তিনি অবিশ্বাসীদের শিকড় কেটে দেন [সুরা আনফালঃ ৭]"**

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, আল্লাহ্‌ দুইটি দলের একটি আমাদের দিতে চেয়েছেন। একটি দল অস্ত্রধারী এবং শক্তিশালী আর একটি দল অস্ত্রধারী নয় এবং দুর্বল। মু'মিনরা প্রথমে দুর্বল হতে চেয়েছিল, অস্ত্র ছাড়াই চেয়েছিল কিন্তু আল্লাহ্‌ সুবঃ আমাদেরকে দুর্বল হতে নিষেধ করেছেন এবং স্পষ্ট সত্য প্রতিপন্ন বাণীর দ্বারা অস্ত্র রাখতে বলেছেন যাতে শত্রুরা আমাদের উপর কর্তৃত্ব না দেখাতে পারে।

রাসুল (সাঃ) বলেন, "দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা সবল মু'মিন আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়"।

অর্থাৎ আমরা শক্তি অর্জন করবো আল্লাহ্‌কে খুশি করার জন্য। এটি একটি ইবাদাত। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, শক্তি বলতে কিসের শক্তি? মনের নাকি শারীরিক?

এ প্রসঙ্গে রাসুল (সাঃ) বলেন, **"জেনে রাখো শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা, শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা, শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা।"**

এখানে রমি অর্থ নিক্ষেপ করা, কেবল তীর নিক্ষেপ করার কথা বলা হয়নি। বরং যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন সকল Latest অস্ত্র নিক্ষেপ করা মুসলিমদের শিখতে হবে। সেটা গ্রেনেড হোক, আরপিজি হোক আর যদি কিছু নাই পাওয়া যায় তবে পাথরই হোক। রাসুল (সাঃ) নিজেও পাথর নিক্ষেপ করেছেন। আর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত এখনও হজের সময় শয়তানকে পাথর মেরে সেখানে উন্মুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌ আরও বলেন, **"আর যখন তুমি তাদের মধ্যে অবস্থান করো আর তাদের জন্য নামাযে দাঁড়াও, তখন তাদের মধ্যের একদল তোমার সঙ্গে দাঁড়াক এবং তাদের অস্ত্রধারণ করুক, কিন্তু যখন তারা সিজদা দিয়েছে তখন তারা তোমাদের পেছন থেকে সরে যাক, আর অন্যদল যারা নামায পড়ে নি তারা এগিয়ে আসুক ও তোমার সঙ্গে নামায পড়ুক, আর তারা তাদের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ও তাদের অস্ত্রগ্রহণ করুক, কেননা যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তারা চায় যে যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও তোমাদের মাল-আসবাব সম্বন্ধে অসাবধান হও তবে তারা তোমাদের উপরে এক ঝাঁপে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর তোমাদের উপরে অপরাধ হবে না যদি তোমরা বৃষ্টিতে বিব্রত হও অথবা তোমরা অসুস্থ হও, ফলে তোমাদের অস্ত্র রেখে দাও, কিন্তু তোমাদের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করো। নিঃসন্দেহ অবিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্‌ তৈরি করেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। [সুরা আন নিসাঃ ১০১]**

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শত্রুরা সবসময় চেষ্টা করে কিভাবে আমাদেরকে অস্ত্র হতে দূরে রাখা যায়, কারণ আমরা অস্ত্র থেকে সামান্য দূরে থাকলেই কাফিররা একযোগে আমাদের উপর হামলা করবে, আমাদের দুর্বল করে ফেলবে। এজন্য আল্লাহ্‌ বলেছেন এমনকি নামাজের সময়েও কিছু মু'মিন অস্ত্র নিয়ে পাহারা দিবে আর নামাজ শেষে বাকিরা আদায় করবে। শুধু তাই নয়, বৃষ্টিতে বিব্রত কিংবা অসুস্থ না হলে অস্ত্র রেখে দেওয়া চরম অপরাধ। কারণ আমাদের কিছুটা অন্যমনস্কে কাফিররা রাজ করবে।

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্য-এর মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন তা প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না;

আল্লাহ্ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।" [সুরা আনফাল ৬০]

এই আয়াতের সকল কিতাবের তাফসীর পড়ে বোঝা যায়, যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া আল্লাহ্‌র হুকুম। এবং এখানে বলা হয়েছে 'যাই কিছু সংগ্রহ করতে পারো'।

কেউ যদি লাঠি পারে তবে সে লাঠিই নিয়ে বের হবে, আর কেউ যদি AK 47 পারে তবে সে সেটা নিয়েই বের হবে। এখানে 'অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে' আল্লাহ্ সুবঃ সবাইকে ছাড়, সুযোগ দিয়েছেন যে যত ভারি আনতে পারবে এটা তার সফলতা।

আল্লাহ্ আবার বলেছেন, 'যেন তা প্রভাব পড়ে আল্লাহ্‌র শত্রুদের উপর'। অর্থাৎ অস্ত্র যাতে শত্রুর উপর প্রভাব ফেলতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এখন এই যুগে তীর কি কাফিরদের উপর প্রভাব ফেলতে পারবে? আপনি কিভাবে লড়বেন ড্রোনের বিরুদ্ধে তীর দিয়ে? আপনি কিভাবে লড়বেন তগুতের বিরুদ্ধে সামান্য হরতাল দিয়ে? এজন্য আপনাকে তাদের ধারেকাছের অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। অস্ত্রের ব্যাপারে কারচুপি নেই। বরং শত্রুর অস্ত্রের নিকট নিজের নিরস্ত্র শরীর বিসর্জন দেওয়া এক ধরনের জুলুম ও আত্মহত্যার শামিল।

শেষে আল্লাহ্ সুবঃ ওয়াদাহ করলেন, 'যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।' অর্থাৎ আপনি যত ভারি ও কার্যকরী অস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকবেন, আপনার যত অর্থ দিয়ে ফি সাবিলিল্লাহ্‌কে পরিপূর্ণ করবেন আল্লাহ্ সুবঃ আপনাকে ঠিক সেই মাপেরই উচ্চ মর্যাদা দান করবেন এবং আপনাকে বিনিময় ফেরত দিবেন। কোন অন্যায় করা হবেনা কারণ এটা আল্লাহ্‌র ওয়াদাহ।

আজকে আমরা যেমন 'কে কত বড় গরু কুরবানি দিতে পারা যায়' তার প্রতিযোগিতা করি, সাহাবীরা (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) তেমনি প্রতিযোগিতা করতেন 'কে কত ভালো অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে পারে, কে কত ভালো যোদ্ধা তৈরি হতে পারে'। আজকে আমরা যেমন আমাদের সন্তানদের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাতে আগ্রহী ঠিক তেমনি সাহাবীরা (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) তাদের সন্তানদের 'সেরা যোদ্ধা' বানাতে সচেষ্ট ছিলেন। এজন্যই তাদের ঈমান এতো মজবুত, তাদের সময় এজন্যই দ্বীন বিজয়ী ছিল। আর আজকে আমাদের দ্বীন বিজয়ী দূরের কথা ঈমানটাই ঠিক মত নেই।

এজন্য একজন মু'মিনের সম্পর্ক হবে অস্ত্রের সাথে। (তারপরেও যে যেমন পারেন রাইফেল, পিস্তল, তীর ধনুক, দা, কোপা, কুড়াল, বল্লম ইত্যাদি সাথে রাখুন)

(গ) মানসিক প্রস্তুতিঃ-

এ যুদ্ধের শুরুতেই সারা পৃথিবীর ইন্টারনেট ও মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া হতে পারে। ফলে, দেশে বিদেশে থাকা আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব এমন কি পরিবারের কেউ যদি প্রবাসে থাকে তার সাথে চিরদিনের মতো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে তার জন্য প্রস্তুত হোন।

বৈদেশিক বানিজ্য ও লেনদেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে আমদানিকৃত পন্য, বিদেশে উৎপাদিত জরুরী ঔষধ ও যন্ত্রপাতি আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, ফলে আপনার কাছের মানুষজন যারা ঐ সব ঔষধের উপর ডিপেন্ডেন্ট তারা চিকিৎসা হীনতায় ভুগবে এবং এমারজেন্সি রোগীরা একপর্যায় মারা যাবে, তার জন্যও প্রস্তুত হোন।

চারিদিকে মৃত্যু, লাশ আর নানান ধরনের অঘটন শুনতে পাবেন, যা এখন কল্পনাতেও আসে না, এমন পরিস্থিতির জন্য মনকে শক্ত করুন।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তীব্র সংকট শুরু হবে..... চাল, ডাল, তেল, লবন ইত্যাদি। আপনার কাছে টাকা থাকবে হাজার হাজার কিন্তু ঐ টাকার বিনিময়েও আপনি জিনিসপত্র কিনতে পারবেন না। ফলে পারিবারিক খাদ্য সংকট কিভাবে সামাল দিবেন সে চিন্তা করুন, মনকে শক্ত রাখুন, কারন এ সময় ভেঙ্গে পরলে বাকিরাও টিকতে পারবে না।

হয়তো নিজ পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য মারা যাবে, আহত হবে, অসুস্থ হয়ে পড়বে, নিখোঁজ হয়ে যাবে এসবের জন্যও মনকে প্রস্তুত রাখুন। এ জাতীয় যে কোন সমস্যাই আসুক না কেন আল্লাহর ইবাদত থেকে গাফেল হওয়া যাবে না, মনে রাখতে হবে এই দুনিয়াটাই পরীক্ষা ক্ষেত্র। এ ধরনের বিপদ আপদ দিয়ে আসলে আল্লাহ আমাদের যাচাই করছেন। আমরা জান্নাতের যোগ্য কি না।

প্রচন্ড অভাবের তাড়নায় আপনার বাড়িতে লুটপাট হতে পারে, হিংস্র হয়ে উঠতে পারে আশোপাশের মানুষ গুলো। তাই আসন্ন পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে আপনার প্রতিবেশীদের এখনি বোঝান। তাদের নিয়েই পরিকল্পনা করুন। যতটা সফল হবেন, পরবর্তীতে ততটাই নিরাপদ থাকতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনরাও গ্রুভাবে বসবাস শুরু করতে পারেন।

ভৌগোলিক ভাবে আমরা বসবাস করছি গাজওয়ায়ে হিন্দের মাঝামাঝি এলাকায়, সুতরাং শত্রু পক্ষ থেকে আক্রান্ত হওয়া প্রায় নিশ্চিত, আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করা সকল দেশে সকল ধর্মে সকল আইনেই বৈধ। সুতরাং প্রতিরোধ করার মতো মানসিক প্রস্তুতি নিন।

জরুরী প্রয়োজনে তাৎক্ষনিক ভাবে বাসস্থান পরিবর্তন করতে হতে পারে, হিজরত করার দরকার পড়তে পারে, আবার এমনও হতে পারে অন্য এলাকা থেকে আপনার এলাকায় লোকজন নিরাপত্তা

বা আশ্রয়ের জন্য ছুটে আসতে পারে। সুতরাং মুহাজির বা আনসার দুটোর জন্যই আবু বকর (রা.) এর মতো প্রস্তুত থাকুন।

(ঘ) অর্থনৈতিক ও খাদ্যের প্রস্তুতিঃ

কৃষিকাজের মাধ্যমে নিজের খাদ্য নিজেই উৎপাদন করুন, ধান, গম, আলু, শাক-সবজি ইত্যাদি।

মাছ চাষ করুন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ- গবাদী পশু পালন করুন (গরু, ছাগল, ভেড়া) ইত্যাদি। হাদীসে এর নির্দেশ রয়েছে।

চাপ কল বা টিউবওয়েল মাটির অনেক গভীরে স্থাপন করুন। সাধারনত যতটুকু নীচ থেকে পানি উঠে তার চাইতে ৫০-১০০ ফুট নীচে। এ ছাড়াও নদী, পুকুর, ঝর্ণার পানি বিশুদ্ধ করে ব্যবহার করার পদ্ধতি জেনে নিন।

পর্যাপ্ত শুকনো খাবার সংগ্রহে রাখুন যেমন, চিড়া, মুড়ি, সীম বা কুমড়ার বিচী, বাদাম, ছোলা, কিসমিস ইত্যাদী।

আপনার ব্যাংক একাউন্ট, ডিপোজিট বা এ জাতীয় খাতে যতটাকা আছে তা এক মুহূর্ত ও নিরাপদ নয়। দ্রুত তুলে ফেলুন। তা দিয়ে স্বর্ণ ক্রয় করুন বা গবাদী পশুতে পরিনত করুন। সোনা রূপাও ক্রয় করতে পারেন।

বাসস্থানের আশেপাশে পর্যাপ্ত ফল গাছ রোপন করুন। বাচ্চাদের কে এখন থেকেই চিপস, চকোলেট, আইসক্রীম জাতীয় খাবার থেকে বিরত রাখার অভ্যাস করুন। শুকনো লাকড়ির ব্যবস্থা করে রাখুন।

এতক্ষন যেসব প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে তা কেবল বেসিক ধারনা দেওয়া হলো। এলাকাভেদে তার থেকে কম বেশী প্রস্তুতি নিতে হতে পারে। তা নিজেই চিন্তা গবেষনা করে বের করুন। সব শেষে যে কথাটি বলে রাখতে চাই, তা এখনি বলে রাখি, প্রযুক্তি ধ্বংস হবার ফলে হয়তো উপযুক্ত সময়ে জানাতে পারবো না-

মনে রাখবেন মহা যুদ্ধের পরপরই দাজ্জাল বের হবে, বের হবার ২-৩ বছর আগে পৃথিবীতে অনাবৃষ্টির ফলে খাদ্য উৎপাদন কমে যাবে, শেষ বছর একেবারেই খাদ্য উৎপাদন হবেনা, আর সে তখন রুটির পাহাড় বা ত্রান নিয়ে হাজির হবে, ঘরে ক্ষুধার্ত স্ত্রী-সন্তান রেখে সে ত্রান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা বড়ই কঠিন পরীক্ষা, বড়ই কঠিন। আর এ মুহূর্তে যদি ধৈর্য্য ধরতে পারেন ‘সুবহানআল্লাহ্’ আপনাকে খাদ্য দেবে ‘আলহামদুলিল্লাহ্’ আপনাকে খাদ্য দেবে, ‘আল্লাহু আকবার’

আপনাকে খাদ্য দেবে। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তার রহমত এবং বরকতে ঢেকে রাখুন। আমাদেরকে পৌঁছে দিন চিরস্থায়ী জান্নাতে। আমিন। হয়তো জানা অজানা আরো বহু ভীতিকর পরিবেশ তৈরি হতে পারে তাই ধৈর্য্য হারাবেন না, অচিরেই সুদিন আসছে।

যখনই কোন বিপদ আসে (মু'মিনরা) বলেঃ **"আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে," [বাকারাহ ১৫৬]**

উম্মতের নারীদের করণীয়

হযরত আবু উমামা বাহেলি (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **"ইসলামের কড়াগুলো একটি একটি করে ভেঙ্গে যাবে। একটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর মানুষ তার পরেরটি আঁকড়ে ধরবে। তো সর্বপ্রথম যে কড়াটি ভাঙবে, সেটি হল ইসলামী শাসন। আর সর্বশেষটি হল নামাজ"। (সু'আবুল ইমান খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৩৬; আল মু'জামুল কাবীর খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৯৮; মাওয়ারিদুয যাম'আন খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৭)**

অর্থাৎ মুসলিম জাতি অধঃপতনের ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম যে বিষয়টি পরিত্যাগ করবে, সেটি হল ইসলামী শাসন। আল্লাহপাকের ঠিক করে দেওয়া যাবতীয় হক আদায় করা, সকল ফরজ আদায় করা এবং ইসলামের দণ্ডবিধির অনুসরণ করা। এই সবগুলি বিষয় ইসলামী খেলাফতের অধীনে অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে বাস্তবায়িত হয়। কাজেই ইসলামী শাসননীতি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়।

মোটকথা, মুসলমানের জীবন থেকে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি হারিয়ে যাবে বলে আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, সেটি হল খেলাফত।

যদি খেলাফতে উসমানিয়ার পতনের (১৯২৪ সাল) এর পর থেকে এ সময় পর্যন্তকার ইতিহাস অধ্যায়ন করা হয়, তাহলে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও সভ্যতা সংস্কৃতির সংরক্ষণ আমাদের ঘরগুলোরই মাধ্যমে আঞ্জাম দেওয়া হয়েছে এবং এই ঘরগুলোই মুসলিম সমাজকে এই পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছে। বহু মুসলিম ভূখণ্ডে এমনও ঘটেছে যে, এই সর্বশেষ দুর্গটি ছাড়া মুসলমানদের কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। এমনকি মসজিদ মাদ্রাসাগুলো পর্যন্ত কাফেরদের দখলে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এই দুর্গগুলোতে অবস্থানরত ইসলামী বাহিনীগুলো সাহস হারায়নি এবং নিজ নিজ রণাঙ্গনে দৃঢ়পদে টিকে রয়েছে।

ইসলামের এই দুর্গগুলোতে যে বাহিনী আছে, তারা হল মুসলিম নারীদের বাহিনী, যারা ইসলামের জন্য সেই মহান কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছে, যা ইসলাম বিরোধীদের হাজার প্রচেষ্টার পর আজও অটুট রয়েছে।

বর্তমানে মুসলিম জাতি যে পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, তা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি। কাজেই এই পরিস্থিতিতে মুসলিম মহিলাদের দায়িত্বও আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। ঈমানদার মা ও বোনদেরকে এখন আগের তুলনায় বেশি সচেতনতা, সাহসিকতা ও পরিশ্রমের সঙ্গে আপন দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ইসলামের শত্রুরা আপনার মোকাবেলায় একনাগাড়ে ৯০ বছর যাবত পরাজয় বরণ করে আসছে। এসব পরাজয় থেকে তারা এই ফলাফলে উপনীত হয়েছে যে, মোকাবেলা করে এই বাহিনীটির বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া যাবে না। আমাদেরকে অন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এবার তারা যে কৌশলটি অবলম্বন করেছে, তা হল মুসলমানদের ঘরগুলোতে যে ইসলামী বাহিনীটি অবস্থান নিয়ে আছে, তাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে উদাসীন করে দিতে হবে। এই কৌশলটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনেকগুলো মনোমুগ্ধকর শ্লোগান নিয়ে দরদী বন্ধুর রূপ ধারণ করে তারা আপনার সামনে এসে হাজির হয়েছে।

কাজেই আমার মা ও বোনেরা! সময়ের নাজুকতা ও শত্রুপক্ষের ধোঁকা-প্রতারণা উপলব্ধি করে আপনাদেরকে তাদের মোকাবিলা করতে হবে। আপন দায়িত্ব কর্তব্য থেকে উদাসীন হবেন না। মুসলমান পুরুষদের বাহিনী, যারা আপন দায়িত্ব থেকে গা বাঁচানোর চেষ্টা করছে, যারা মানসিকভাবে পরাজয়ের শিকার হয়ে আছে, হতাশার কালো মেঘ যাদের ঘিরে রেখেছে, আপনারা মহিলাদেরকে আল্লাহ এই যোগ্যতা দান করেছেন যে, আপনারা পলায়মান এই বাহিনীটিকে সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগাতে পারেন, তাদের অবশ বাহুগুলোতে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করে দিতে পারেন, ভীত সন্ত্রস্ত পুরুষদের মাঝে আত্মপরিচয় ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তাদেরকে কর্তব্য পালনের উপযোগী বানিয়ে তুলতে পারেন।

মহান আল্লাহ আপনাদেরকে সত্ত্বাগতভাবেই একটি সংগঠন হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। একজন নারী মানেই একটি সংগঠন। একারণে দাজ্জালের ফেতনার বিরুদ্ধে আপনারা অনেক বেশি কাজ করতে পারেন।

সন্তানদেরকে খাঁটি মুসলমান বানানো এবং তাদেরকে সর্বাবস্থায় ইসলামী নীতি-আদর্শের প্রহরী হিসাবে গড়ে তোলা মহিলাদেরই দায়িত্ব। সন্তানদের মন মস্তিষ্ককে শৈশব থেকেই একথাটি বসিয়ে দিতে হবে যে, তার ঈমান জগতের প্রতিটি বস্তুর চেয়ে মূল্যবান। কাজেই ঈমানকে বাঁচিয়ে রাখতে যদি সমগ্র দুনিয়াকেও কুরবানী দিতে হয়, তাহলে অকুণ্ঠচিত্তে তা করতে হবে। তবুও ঈমানের গাঁয়ে আঁচড়টিও লাগতে দেওয়া যাবে না।

হযরত ইমরান ইবনে সুলাইম কালায়ি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, **"একজন নারীর নিজ গৃহের মাঝে ছুটে বেড়ানো তার জন্য জুতাজোড়া অপেক্ষা উত্তম। স্থূলকায়া নারীদের জন্য ধ্বংস অবধারিত। সুসংবাদ গরীব মহিলাদের জন্য। তোমরা তোমাদের নারীদেরকে সোলওয়ালা শক্ত জুতা পরিধান করাও আর তাদেরকে তাদের ঘরের মাঝে হাঁটাচলা করার প্রশিক্ষন দাও। কারণ, অদূর ভবিষ্যতে তারা এই কাজটি করতে বাধ্য হতে পারে"**। (আল ফিতান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৫১)

এই বর্ণনায় বলা হয়েছে, মুসলিম নারীদেরকে আরাম প্রিয় না হওয়া উচিৎ। বরং তাদেরকে সোলওয়ালা শক্ত জুতা পরিধান করে নিজ ঘরে হাঁটা চলা করে জীবন অতিবাহিত করায় অভ্যস্ত হতে হবে, যাতে শরীরটা ক্ষীণ থাকে। কারণ, তাদের জীবনে এমন পরিস্থিতির আগমন করতে পারে যে, তখন নিজের সম্ভ্রম ও ঈমান বাঁচানোর তাগিদে তাদেরকে পাহাড়-বনে-জঙ্গলে পায়ে হেঁটে সফর করতে হবে। যেমনটি আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, কাশ্মির, সিরিয়ায় ঘটছে।

তাই কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে আমল করুন এবং গোটা পরিবার ও বংশের লোকদের মাঝে যথারীতি ঈমানের অভিযান পরিচালনা করুন। দাজ্জালের মহা ফেতনার ভয়াবহতা সম্পর্কে নিজেও সজাগ সচেতন থাকুন, অন্যদেরকেও সচেতন করে তুলুন।

স্মরণ করুন ইরাকের সেই অসহায় মায়েদের, ফিলিস্তিনের সেই বোনদের, যাদের হাতের মেহেদী শুকানোর আগেই তাদের সোহাগ উজাড় করে দেওয়া হয়েছে।

স্মরণ করুন, কাশ্মির ও আফগানিস্তানের সে কন্যাদের, যারা জীবনের প্রতিটি পলক ও প্রতিটি মুহূর্ত বিহ্বলতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে থাকে।

স্মরণ করুন, সিরিয়ার সেই নিষ্পাপ শিশুদের, যারা খোলা আকাশের নিচে মা! মা! করে চিৎকার করছে, কিন্তু তাদের মায়েদের ইমাম মাহদির আগমনপূর্ব আলামত বহনকারী নুসাইরিয়া সম্প্রদায়ের বনু কাল্ব গোত্রের জালেমরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

আমাদের মা ও বোনদের ভুলে গেলে চলবেনা, যে দাজ্জালের সঙ্গে মহাযুদ্ধের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের (ভারতীয় উপমহাদেশের) মুজাহিদদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

হযরত নাহীক ইবনে সারীম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিকদের (মূর্তিপূজারীদের) সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এমনকি এই যুদ্ধে তোমাদের বেঁচে যাওয়া মুজাহিদরা উর্দুন (জর্ডান) নদীর তীরে দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এই যুদ্ধে তোমরা পূর্ব দিকে অবস্থান গ্রহণ করবে আর দাজ্জালের অবস্থান হবে পশ্চিম দিকে"। (আল ইসাবা, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪৭৬)

এখানে মুশরিকদের দ্বারা উদ্দেশ্য উপমহাদেশের মূর্তিপূজারী জাতি। তার মানে এটি হাদিস শরীফে বর্ণিত সেই যুদ্ধ **"গাজওয়াতুল হিন্দ"**। যেখানে মুজাহিদরা এই উপমহাদেশে আক্রমণ চালাবে, আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করবেন, ক্ষমা করে দেবেন, বেঁচে যাওয়া মুজাহিদরা জেরুজালেমে ফিরে যাবে এবং সেখানে ঈসা (আঃ) সাক্ষাত পাবে এবং ঈসা (আঃ) নেতৃত্বে দাজ্জালের বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে।

বর্তমানে এই উপমহাদেশের মূর্তিপূজারী ভূখণ্ডের, মুসলিম প্রধান ভূখণ্ডের উপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের অব্যাহত প্রচেষ্টা দেখলে বুঝা যায় যে, এটি একদিন চূড়ান্ত সংঘাতময় রূপ ধারণ করবে এবং এখানকার দ্বীন ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর ভবিষ্যত বাণী মোতাবেক উম্মতের একটি দলকে এই দিকে অগ্রসর হতে হবে। এবং এটি ঘটবে সেই সমসাময়িক সময়ে যখন সমগ্র দুনিয়াতে ইসলামের ক্রান্তিলগ্নে ইসলামকে খেলাফতের আদলে সাজাতে আল্লাহ ইমাম মাহদিকে প্রেরণ করবেন আর যার খেলাফতের সপ্তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং দাজ্জালের সাথে মহাযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে ঈসা (আঃ) এর আগমন ঘটবে।

তাই, দ্বীনের উপর দৃঢ়পদ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রেখে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের মা বোনদের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন আমিন।

ক্বাসীদায়ে শাহ নিয়ামতুল্লাহ

আমরা শাহ নিয়ামতুল্লাহর ক্বাসীদা উল্লেখ করেই আমাদের অভিযান সমাপ্ত করব। আল্লাহ সবাইকে হক্বের পেয়ালা থেকে পান করার তাওফিক দান করুন।

আজ থেকে প্রায় ৮০০ বছর আগে উপমহাদেশের বিখ্যাত বুজুর্গ, শাহ নিয়ামতুল্লাহ (র.) স্বীয় ইলহামের মাধ্যমে বিশ্ব বিশেষ করে উপমহাদেশের ঘটনাপ্রবাহের আলোকে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। যাকে ক্বাসীদায়ে শাহ নেয়ামতুল্লাহ বলা হয়। এ যাবৎকালে যার সবগুলোই হুবহু বাস্তবায়িত হয়েছে। ক্বাসীদার শেষ দিকে শেষ যামানায় দুনিয়ার অবস্থাসহ গাজওয়াতুল হিন্দ, ইমাম মাহদীর আলোচনাও এসেছে। ভারত-পাকিস্তানের মুসলমানদের কাছে এই ক্বাসীদা খুবই জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ। বৃটিশ শাসনের সময় এই ক্বাসীদাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বাংলাদেশেও ইসলামকি ফাউন্ডেশন ক্বাসীদায়ে সওগাত নামক আধ্যাত্মিক কবিতার বইয়ে ক্বাসীদায়ে শাহ নিয়ামতুল্লাহ প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের আলোচনায় বলেছি, সারা বিশ্ব থেকে বিশেষত আফগানিস্থান থেকে হিন্দুস্তান মুক্তির জন্যে মুজাহিদীনরা আসবে। এই ক্বাসীদাতেও সে কথার সত্যায়ন করা হয়েছে! আমরা ক্বাসীদার মাঝামাঝি থেকে কতিপয় চরণ নিচে উল্লেখ করে দিচ্ছি-

(২৭)

কালের চক্রে স্নেহ-তমীজের ঘটিবে যে অবসান

লুণ্ঠিত হবে মানী লোকদের ইজ্জত সম্মান

(২৮)

উঠিয়া যাইবে বাছ ও বিচার হালাল ও হারামের

লজ্জা রবে না, লুণ্ঠিত হবে ইজ্জত নারীদের

(২৯)

পশুর অধম হইবে তাহারা ভাই-বোনে, মা-বেটায়

জেনা ব্যাভিচারে হইবে লিপ্ত পিতা আর কন্যায়

(৩০)

নগ্নতা আল অশ্লীলতায় ভরে যাবে সব গেহ

নারীরা উপরে সেজে রবে সতী ভেতরে বেচিবে দেহ

(৩১)

উপরে সাধুর লেবাস ভেতরে পাপের বেসাতি পুরা

নারী দেহ নিয়ে চালাবে ব্যবসা ইবলিস বন্ধুরা

(৩২)

নামায ও রোজা, হজ্জ্ব যাকাতের কমে যাবে আগ্রহ

ধর্মের কাজ মনে হবে বোঝা দারুন দুর্বিষহ

(৩৩)

কলিজার খুন পান করে বলি শোন হে বৎসগণ

খোদার ওয়াস্তে ভুলে যাও সব নাসারার আচরণ

(৩৪)

পশ্চিমা ঐ অশ্লীলতা ও নগ্নতা বেহায়ামি

ডোবাবে তোদের, খোদার কঠোর গজব আসিবে নামি

(৩৫)

ধ্বংস নিহত হবে মুসলিম বিধর্মীদের হাতে

হবে নাজেহাল, ছেড়ে যাবে দেশ ভাসিবে রক্তপাতে

(৩৬)

মুসলমানের জান-মাল হবে খেলনা- মুল্যহত

রক্ত তাদের প্রবাহিত হবে সাগর স্রোতের মত

(৩৭)

এরপর যাবে ভেগে নারকীরা পাঞ্জাব কেন্দ্রের

ধন সম্পদ আসিবে তাদের দখলে মুমিনদের

টীকা ১: এখানে পাঞ্জাব কেন্দ্রের বলতে কাশ্মির মনে করা হয়।

টীকা ২: প্রথম মত: ১৯৪৮ সালে মুসলিম সুলতান নিজামের অধীনস্থ হায়দারাবাদ শহরটি দখল করে নেয় হিন্দুরা। সে সময় প্রায় ২ লক্ষ মুসলমানকে শহীদ করে মুশরিক হিন্দুরা, ১ লক্ষ মা বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করে, হাজার হাজার মসজিদ বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেয়। শুধু নিজামের প্রাসাদ থেকে নিয়ে যায় ৪ ট্রাক সোনা গয়না।

দ্বিতীয় মত: হিন্দুস্তানের যুদ্ধের পুর্বে মুসলিমরা সর্বপ্রথম ভারতের কাছ থেকে একটি এলাকা দখল করে নেবে। এটা হচ্ছে পাকিস্তান সীমান্তলগ্ন পাঞ্জাব ও জম্মু-কাশ্মির এলাকাটা। কারণ কাশ্মিরের স্থানীয় মুজাহিদ, তালেবান সহ আরো অনেক জিহাদী গ্রুপ ব্যপক আকারে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে জম্মু কাশ্মিরকে ভারতের দখল থেকে মুক্ত করার জন্য।

(৩৮)

অনুরূপ হবে পতন একটি শহর মু'মিনদের

তাহাদের ধনসম্পদ যাবে দখলে হিন্দুদের

(৩৯)

হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ সেখানে চালাইবে তারা ভারি

ঘরে ঘরে হবে ঘোর কারবালা ক্রন্দন আহাজারি

টিকা: ৩৮ ও ৩৯ নং প্যারায় বলা হয়েছে, মুসলিমরা যখন কাশ্মির দখল নেবে এর পরই হিন্দুরা মুসলিমদের একটি এলাকা দখলে নেবে। এবং সেখানে ব্যাপক হত্যা ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। মুসলমানদের ধন-সম্পদ ভারত সরকার লুটপাটের মাদ্ধমে নিয়ে নেবে, মুসলিমদের ঘরে ঘরে কারবালার ন্যায় রূপ ধারন করবে কিন্তু আপনি কি জানেন? মুসলিমদের যে দেশটা ভারত সরকার দখলে নিয়ে এ ধরনের হত্যা ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে সেটা কোন দেশ? হা সেটা আপনার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। অর্থাৎ মুসলমানরা কাশ্মির জয় করার পর হিন্দুরা বাংলাদেশ দখল করবে।

(৪০)

মুসলিম নেতা-অথচ বন্ধু কাফেরের তলে তলে

মদদ করিবে অরি কে সে এক পাপ চুক্তির ছলে

টীকা: বর্তমান সময়ে এই উপমহাদেশে এ ধরনের নেতার অভাব নেই। যারা উপর দিয়ে মুসলমানদের নেতা সেজে থাকে, কিন্তু ভেতর দিয়ে কাফিরদের এক নম্বর দালাল। সমগ্র ভারতে উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তানে এর যথেষ্ট উদাহরণ আছে-যে নেতারা নামধারী মুসলমান হবে, কিন্তু গোপনে গোপনে হিন্দুবান্ধব হবে। মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য ভারত সরকাররের সাথে গোপনে পাপ চুক্তি করবে।

(৪১)

প্রথম অক্ষরে থাকিবে শীনে'র অবস্থান

শেষের অক্ষরে থাকিবে নূন' ও বিরাজমান

ঘটিবে তখন এসব ঘটনা মাঝখানে দু'ঈদের

ধিক্কার দিবে বিশ্বের লোক জালিম হিন্দুদের

টীকা: ইসলাম ধ্বংসকারি এই শাসককে চিনার উপায় হল তার নামের প্রথম অক্ষর হবে (শ) এবং শেষের অক্ষর হবে (ন)। উপমহাদেশে হিন্দুদের সাথে সখ্যতা রাখে কোন নেতার নামের শুরুতে 'শ' এবং শেষে 'ন' হিসেব করুন। আর এসব ঘটনা ঘটবে দুই ঈদের মাঝে। যেটা হতে পারে আগামি ঈদ থেকে দুই তিন বছরের মধ্যে। প্রিয়ে ভায়েরা একটু কল্পনা করুন এদেশে যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী ঢুকে আপনার পিতা, আপনার ভাই ও আত্নীয় সজনদের নির্মমভাবে হত্যা করবে আপনার মা বোনদের ধর্ষন করবে তখন কি অবস্থা হবে একটু ভেবেছেন? আপনি ভেবেছেন কি আপনার সাজানো সংসার, আপনার চাকুরী আপনার ব্যবসার ভবিষ্যৎ কি? সময় খুব অল্প যুদ্ধের প্রস্তুতি নিন হিন্দু মালাউনদের কচুকাটা করার জন্য। এছাড়া যে আর কোন পথ নেই। এটাই রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভবিষ্যৎবানী।

(৪২)

মহরম মাসে হাতিয়ার হাতে পাইবে মুমিনগণ

ঝঞ্ঝারবেগে করিবে তাহারা পাল্টা আক্রমণ

(৪৩)

সৃষ্টি হইবে ভারত ব্যাপিয়া প্রচণ্ড আলোড়ন

'উসমান' এসে নিবে জেহাদের বজ্র কঠিন পণ

(৪৪)

'সাহেবে কিরান-'হাবীবুল্লাহ' হাতে নিয়ে শমসের

খোদায়ী মদদে ঝাঁপিয়ে পড়িবে ময়দানে যুদ্ধে

টীকা: এখানে মুসলমানদের সেনাপতির কথা বলা হয়েছে। শনি ও বৃহস্পতিগ্রহ অথবা শুক্র ও বৃহস্পতি গ্রহের একই রৈখিক কোণে অবস্থানকালীন সময়ে যে যাতকের জন্ম অথবা এ সময়ে মাতৃগর্ভে যে যাতকের ভ্রুনের সঞ্চার ঘটে তাকে বলা হয় সাহেবে কিরান বা সৌভাগ্যবান। সেই মহান সেনাপতির নাম বা উপাধি হবে 'হাবীবুল্লাহ'।

(৪৫)

কাঁপিবে মেদিনী সীমান্ত বীর গাজীদের পদভারে

ভারতের পানে আগাইবে তারা মহারণ হুঙ্কারে

টীকা: আক্রমণকারীরা ভারত উপমহাদেশের হিন্দু দখলকৃত এলাকার বাইরে থাকবে এবং হিন্দু দখলকৃত এলাকা দখল করতে হুঙ্কার দিয়ে এগিয়ে যাবে।

(৪৬)

পঙ্গপালের মত ধেয়ে এসে এসব 'গাজীয়ে দ্বীন'

যুদ্ধে জিতিয়া বিজয় ঝাণ্ডা করিবেন উড্ডিন

(৪৭)

মিলে এক সাথে দক্ষিণী ফৌজ ইরানী ও আফগান

বিজয় করিয়া কবজায় পুরা আনিবে হিন্দুস্তান

টীকা: হিন্দুস্তান সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের দখলে আসবে।

(৪৮)

বরবাদ করে দেওয়া হবে দ্বীন ঈমানের দুশমন

অঝোর ধারায় হবে আল্লা'র রহমাত বরিষান

(৪৯)

দ্বীনের বৈরী আছিল শুরুতে ছয় হরফেতে নাম

প্রথম হরফ গাফ সে কবুল করিবে দ্বীন ইসলাম

টীকা: ছয় অক্ষর বিশিষ্ট একটি নাম যার প্রথম অক্ষরটি হবে 'গাফ' এমন এক প্রভাবশালী হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম পক্ষে যোগদান করবেন। তিনি কে তা এখন বুঝা যাচ্ছে না।

(৫০)

আল্লা'র খাস রহমাতে হবে মুমিনেরা খোশদিল

হিন্দু রসুম-রেওয়াজ এ ভূমে থাকিবে না এক তিল

টীকা: ভারত বর্ষে হিন্দু ধর্ম তো দূরে হিন্দুদের কোন রসম রেওয়াজও থাকবে না। (সুবহানাল্লাহ)

(৫১)

ভারতের মত পশ্চিমাদেরও ঘটিবে বিপর্যয়

তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে ঘটাইবে মহালয়

টীকা: বর্তমান সময়ে স্পষ্ট সেই তৃতীয় সমরের প্রস্তুতি চলছে। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব জুড়ে মুসলমাদের বিরুদ্ধে কাফিররা যুদ্ধ করছে তথা জুলুম নির্যাতন করছে। এই জুলুম নির্যাতনই তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধে রূপ নিয়ে একসময় তাদের ধ্বংসের কারণ হবে। এখানে বলা হচ্ছে মহালয় বা কেয়ামত শুরু হবে যাতে পশ্চিমারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

(৫২)

এ রণে হবে 'আলিফ' এরূপ পয়মাল মিসমার

মুছে যাবে দেশ, ইতিহাসে শুধু নামটি থাকিবে তার

টীকা: এ যুদ্ধের কারণে আলিফ = আমেরিকা এরূপ ধ্বংস হবে যে ইতিহাসে শুধু তার নাম থাকবে, কিন্তু বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব থাকবে না। বর্তমানে মুছে যাওয়ার আগাম বার্তা স্বরূপ দেশটিতে আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অর্থনৈতিক মন্দা চরমভাবে দেখতে পাচ্ছি।

(৫৩)

যত অপরাধ তিল তিল করে জমেছে খাতায় তার

শাস্তি উহার ভুগতেই হবে নাই নাই নিস্তার

কুদরতী হাতে কঠিন দণ্ড দেওয়া হবে তাহাদের

ধরা বুকে শির তুলিয়া নাসারা দাড়াবে না কভু ফের

টীকা: এখানে স্পষ্ট যিনি এই শাস্তি দিবেন তা হবে কুদরতি হাতে। যদিও বা আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে কুদরত, নবী রাসুলের ক্ষেত্রে মুজিজা, এবং ওলী আল্লাহ গণের ক্ষেত্রে কারামত শব্দ ব্যাবহৃত হয়। এখানে কাফিরদের শাস্তি কোন ওলী আল্লাহ কারামতের মাধ্যমেই দিবেন এটাই বুঝান হয়েছে। এই শাস্তির কারণে নাসারা বা খ্রিস্টানরা আর কখনই মাথা তুলে দাড়াতে পারবে না।

(৫৪)

যেই বেঈমান দুনিয়া ধ্বংস করিল আপন কামে

নিপাতিত শেষকালে সে নিজেই জাহান্নামে

(৫৫)

রহস্যভেদী যে রতন হার গাথিলাম আমি তা - যে

গায়েবী মদদ লভিতে, আসিবে উস্তাদসম কাজে।

(৫৬)

অতিসত্বর যদি আল্লা'র মদদ পাইতে চাও

তাহার হুকুম তামিলের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দাও

টীকাঃ বর্তমানে সমস্ত ফিতনা হতে হিফাজত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সমস্ত হারাম কাজ থেকে খাস তওবা করা। সেটা হারাম আমল হোক কিংবা কাফের মুশরিক প্রণীত বিভিন্ন নিয়ম কানুন হোক।

(৫৭)

'কানা জাহুকার' প্রকাশ ঘটার সালেই প্রতিশ্রুত

ইমাম মাহাদি দুনিয়ার বুকে হবেন আবির্ভূত

টীকাঃ 'কানা জাহুকা' সুরা বনী ইসরাইলের ৮১ নং আয়াতের শেষ অংশ। যার অর্থ মিথ্যার বিনাশ অনিবার্য। পূর্ব আয়াতটির অর্থ 'সত্য সমাগত মিথ্যা বিলুপ্ত'। অর্থাৎ যখন মিথ্যার বিনাশ কাল উপস্থিত হবে তখন উপযুক্ত সময়েই আবির্ভূত হবেন 'মাহদী' বা 'পথ প্রদর্শক'। উনার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে বাতিল ধ্বংস হবে।

(৫৮)

চুপ হয়ে যাও ওহে নেয়ামত এগিও না মোটে আর

ফাঁস করিও না খোদার গায়বী রহস্য - আসরার

এ কাসিদা বলা করিলাম শেষ 'কুনুত কানয' সালে

(অদ্ভুত এই রহস্য গাঁথা ফলিতেছে কালে কালে)

টীকাঃ 'কুনুত কানয সাল' অর্থাৎ হিজরি সন ৫৪৮ মোতাবেক ১১৫৮ ইংরেজি সাল হচ্ছে এ ক্বাসিদার রচনা কাল। এটা আরবি হরফের নাম অনুযায়ী সাংকেতিক হিসাব

এ উম্মতের বিশেষ করে উপমহাদেশের প্রতিজন মুসলিমের বিবেকের দরজায় কড়া নেড়ে আমরা বলব-

আমাদের শেষ কথা, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক!

وسلام عليكم

-----সমাপ্ত-----

গাজওয়াতুল হিন্দের জন্য

প্রস্তুতি নাও